সম্পাদকীয়

অপরের সুখ-দুঃখে অংশীদার হওয়া

অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া যেমন জরুরী, অপরের সুখে আনন্দিত হওয়াও তেমনি জরুরী। আমরা নিজেরা যেমন দুঃখী হতে চাইনা। অপর কারো দুঃখও আমাদের অপছন্দ। তাই কারো দুঃখ-বেদনা দেখলে আমরাও বেদনাবিধুর হই। তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করি। অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়ার এই মনোবৃত্তি প্রায় সকল মানুষেরই আছে। এ যেন মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

মুমিনদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ভালবাসা, মায়ামমতা, স্নেহ পরায়ণতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহই নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে ভোগে। অর্থাৎ দেহের একটি অঙ্গ অসুস্থ বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে গোটা দেহই সে কষ্ট অনুভব করে। মুমিনদের অবস্থা ঠিক তাই। যে কোনো একজন মুমিন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হলে গোট মুমিন সমাজ সে দুঃখ অনুভব করে এবং তা দূর করার জন্য এগিয়ে আসে।

কারো বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট দেখলে প্রাণ কাঁদে না, এমন মানুষ একেবারেই বিরল। কিন্তু অপরের সুখ-সুবিধা ও উন্নতি-অগ্রগতি একেবারেই সহ্য করতে চায় না- এমন মানুষেরও অভাব নেই।

এক্ষেত্রে ইসলাম ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। সুখ আর দুঃখ দু'টোতেই ভাগী হতে বলে। আমি যেমন চাই যে, আমার দুঃখে সে ব্যথিত হোক, সমবেদনা জানাক। আমার মতো দুঃখ-বেদনা তার না হোক। তেমনি চাইব আমার মতো সুখ, স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্য যেন তার নসীব হয়। অন্যের কল্যাণ কামনাকে ইসলাম দ্বীনের দাবী হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ইসলাম বলছে নিজের জন্য আমরা যা যা পছন্দ করি, অপরের জন্যও যেন তাই পছন্দ করি। আর এটিকে ইসলামে প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে।

সুতরাং অপরের দুঃখে আমরা যেমন দুঃখী হই, অপরের সুখেও আমাদেরকে সুখী হতে হবে; ঈর্ষান্বিত হলে চলবে না। আমরা নিজের জন্য যা অপছন্দ করি, অপর ভাইয়ের জন্যও তা অপছন্দ করব। আবার নিজের জন্য যা পছন্দ করি, অপর ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করব।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় মানুষ অবর্ণনীয় কষ্টে নিপতিত হয়েছে। বন্যার প্রবল স্রোতে অসংখ্য মানুষের ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে। এ সকল মানুষ আকস্মিক বিপদে চরম অসহায়ত্বের স্বীকার হয়েছে। দুর্দশা কবলিত এ সকল মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য এগিয়ে আসা সামর্থবান মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এটি একটি নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দুঃখ অন্য সকলে ভাগাভাগি করে নিলে মানুষগুলো কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাবে। দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়ে আবার তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে। তাই সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান আসুন, আমরা এসকল মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই এবং তাদের পাশে দাঁড়াই। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দিন। আমীন। ■

নেতৃত্বের কতিপয় গুণাগুণ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

{وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ}

অনুবাদ: 'আর বাদশাহ বলল, তাকে (ইউসুফ) আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার নিজের জন্য আপন করে নেব। তারপর বাদশাহ যখন তার সাথে কথা বলল, তখন বাদশাহ বলল, আজ আপনি তো আমাদের কাছে মর্যাদাশীল, আস্থাভাজন। তিনি বলেন, আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ। আর এভাবে ইউসুফকে আমরা সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছে অবস্থান করতে পারতেন। আমরা যাকে ইচ্ছে তার প্রতি আমাদের রহমত দান করি; এবং আমরা মুহসিনদের পুরস্কার নষ্ট করি না। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম', [ইউসুফ– ১২: ৫৪– ৫৭]।

নামকরণ, সূরার ৪ নং আয়াতে উল্লেখিত 'ইউসুফ' নামকেই সূরাটির নাম হিসেবে নেয়া হয়েছে। কারণ পুরো সূরাতেই ইউসুফ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

নাযিলের প্রেক্ষাপট: সূরা ইউসুফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে, [তাফসীরুল কুরতুবী৯/১১৮, ইবন কাসীর ৪/৩৬৫]। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ও কাতাদা বলেন, এর চারটি আয়াত মাদানী জীবনে নাযিল হয়েছে, [তাফসীরুল কুরতুবী৯/১১৮]। কারো কারো মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সহধর্মিনী ও সর্বক্ষণের সহযোগী উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার (রা) বিয়োগ এবং তার পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর শোকাবস্থায় সূরা ইউসুফ নাযিল ছিল তার জন্য এক বিরাট শান্তনা। কারো মতে ইহুদীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়।

মূল বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয়: একটি সূরাতেই নাবী ইউসুফ ('আ) এর ঘটনার পরিপূর্ণ বর্ণনা, যা অন্য কোন নাবীর ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে হয়নি। আল কুরআন এটিকে 'আহসানুল কাসাস' বা উত্তম কাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছে। ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়া'কূব ও ইউসূফ ('আ) সকলই একই দীনের অনুসারী এবং তাদের দা'ওয়াত ও সর্বশেষ রাসূল

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা‘ওয়াত একই। ইউসুফ (‘আ) ও রাসূলুল্লাহর জীবনের মধ্যে সার্বিক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যতা রয়েছে। আদর– যত্ন, ভালোবাসা, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন, পরীক্ষা এবং সব শেষে সফলতা অর্জন এবং শত্রুদেরকে সাধারণ ক্ষমা করে দেয়া, এসবই উল্লেখযোগ্য দিক। মানুষের পরিকল্পনায় চূড়ান্ত কিছু হয় না, চূড়ান্ত পর্যায়ে পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয় আল্লাহর পরিকল্পনা। আল্লাহ তা‘আলার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি যদি সত্যিকার ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হয় এবং বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার গুণেও গুণান্বিত হয় তাহলে চরিত্র বলে মানুষ ও দেশ জয় করতে পারে। পূরো ঘটনার সবালীল জীবন, চড়াই উৎরাই প্রায় সবকিছুতেই ইউসূফ (‘আ) এর ঘটনার সাথে সর্বশেষ রাসূলুল্লাহর মিল রয়েছে। সুতরাং সূরা ইউসূফের প্রতিটি আয়াতে আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার উম্মাতের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ইউসুফ ‘আলাইহিস সালামকে মিথ্যা অভিযোগে কারাবরণ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি মিসরের বাদশাহর কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত দাবী করেন। তার দাবী অনুযায়ী বাদশাহ মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করেন। ‘আযীয পত্নী ও অন্যান্য মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করে। তখন বাদশাহ ইউসুফকে তার কাছে হাযির করার নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহর বাণীতে সে কথাই ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ.

‘আর বাদশাহ বলল, তাকে (ইউসুফ) আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার নিজের জন্য আপন করে নেব। তারপর বাদশাহ যখন তার সাথে কথা বলল, তখন বাদশাহ বলল, আজ আপনি তো আমাদের কাছে মর্যাদাশীল, আস্থাভাজন’। অর্থাৎ বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস। আমি তাকে আমার একান্ত উপদেষ্টা নিয়োগ করব। তারপর ইউসুফ (‘আ)কে কারাগার থেকে রাজার দরবারে আনা হল। বাদশাহ তার সাথে আলাপ–আলোচনায় পরীক্ষার মাধ্যমে তার যোগ্যতা, প্রতিভা, দক্ষতা, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য–সহিষ্ণুতা ও চারিত্রিক মাধুর্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বললেন, আপনি এখন থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ ও বিশ্বস্ত। আপনার বিষয়ে বিশ্বাসভঙ্গ ও খিয়ানাতের কোন আশংকা নেই, [তাফসীরুল কুরতুবী ৯/২১০,২১২, ইবন কাসীর ৪/৩৯৫, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ১/১২২৪]। বাদশাহ আলাপকালে কেবল তার এসব গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন মোটেও তা নয়। বরং বলা যায় যে,বাদশাহর সাথে সাক্ষাতকারের মাধ্যমেও এসব গুণাগুণ তার নিকট আরো তৃপ্তিদায়ক ও স্বস্তিদায়কভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা ইউসুফ (‘আ) দীর্ঘকাল ধরেই ধারাবাহিক পরীক্ষার ক্ষেত্রগুলো অতিক্রম করে এসেছেন। তাই স্বভাবিকভাবেই বাদশাহ থেকে শুরু করে মিসরের বড় ছোট, আবাল– বৃদ্ধ– বনিতা সবাই এ সম্পর্কে অবগত ছিল। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি একথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আমানতদারী, সততা, ধৈর্য, সংযম, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার ক্ষেত্রে অন্তত সমকালীন লোকদের মধ্যে কেউ তার সমকক্ষ ছিল না, তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, [তাফহীমুল কুরআন ৬/১০৫]।

মহান আল্লাহর বাণী, قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ **‘তিনি (ইউসুফ) বলেন, আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ’,**। অর্থাৎ, মিসরের বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখায় আসা দুর্ভিক্ষের কথা এবং দুর্ভিক্ষের সংকট

কিভাবে মোকাবেলা করা হবে তার সুবিজ্ঞ, সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবসম্মত সমাধান শুনে বাদশাহ যারপর নেই মুগ্ধ ও আনন্দিত হলেন। তারপর বাদশাহ বলেন, এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? তখন ইউসুফ ('আ) বলেন, জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করব এবং এক্ষেত্রে কোন কম-বেশী করব না। (حَفِيْظ) শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং (عَلِيْم) শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তাবোধক, [তাফসীরুত তাবারী ১৬/১৫০, তাফসীরুল কুরতুবী ৯/২১২, ২১৩, ইবন কাসীর ৪/৩৯৫, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ১/১২২৪]। এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজন যে, ইউসুফ ('আ) এর উক্তি, اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ 'আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন'। এ উক্তি থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইউসুফ ('আ) মিসর সরকারের কেবলমাত্র একটি বিভাগের দায়িত্ব পালনের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ তিনি তখনকার প্রতিষ্ঠিত সরকারের অধীনেই সরকারের অংশীদার হিসেবে তার এ দায়িত্ব পালন করবেন? প্রথমতঃ একজন নাবী, যিনি তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}

'হে আমার কারা সাথীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন অনেক রব উত্তম, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ', [ইউসুফ- ১২: ৩৯]। তাছাড়াও ইউসুফ ('আ) এর উক্তি আল্লাহ তা'আলার ভাষায় বিবৃত হয়েছে, আল্লাহ বলেন,

{مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

'তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের 'ইবাদাত করছ, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষ রেখেছ, এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ নাযিল করেননি। বিধান দেয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধু তাঁকে ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত করো না। এটাই শ্বাশ্বত দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না',[ইউসুফ- ১২: ৪০]। ইউসুফ ('আ) এর কাহিনীর মধ্যে এ কথাটি হচ্ছে মূল ও প্রাণ। এ আয়াতটি আল-কুরআনের তাওহীদ সম্পর্কিত সর্বোত্তম বক্তব্যগুলোর অন্যতম। উপর্যুক্ত দু'টা আয়াত সম্পর্কে বলা যায় যে, ইউসুফ ('আ) যখন দেখলেন যে, তারা তাকে সম্মান করেই প্রশ্ন করছে তখন এটাকেই তিনি তাওহীদ ও ইসলামের দিকে দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, তাদের স্বভাবে কল্যাণ গ্রহণের ও সত্য শোনার প্রবণতা আছে। তিনি দা'ওয়াত দানের এ সুযোগটি গ্রহণ করেন, [তাফসীর ইবন জারীর আত্- তাবারী১৬/১০৫-১০৬]। এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, একজন নাবী তার প্রতি প্রত্যাদেশকৃত দীনের তাওহীদ ও শারী'য়াতের বাইরে থেকে প্রচলিত মানব রচিত কোন শাসনব্যবস্থার অধীনে সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন বা এ ধরনের দায়িত্ব পালনে আগ্রহ দেখাবেন তা কল্পনাও করা যায় না। তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে ইউসুফ ('আ) মিসরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন এবং মিসরের শাসনভার

তার উপরই ন্যস্ত ছিল। আল–কুরআনের অন্যান্য আয়াত এ বিষয়টিকেই ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে, যা পরবর্তী আয়াতে আরো স্পষ্ট হবে।

ইমাম আল–কুরতুবী এ আয়াতের তাফসীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তা হচ্ছে, এ আয়াত স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে, কোন ব্যক্তি কোন দায়িত্বের উপযুক্ত হলে তিনি সে দায়িত্ব পাওয়ার জন্য নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা তুলে ধরে তা চাইতে পারেন। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সাহাবী 'আব্দুর রাহমান ইবন সামুরাহ (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

'হে 'আব্দুর রাহমান! তুমি নেতৃত্ব বা দায়িত্ব চেয়ে নিও না। কেননা তোমার চাওয়ার প্রেক্ষিতে সে দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হলে তোমাকে সেই দায়িত্বের কাছে ন্যস্ত করা হবে। আর চাওয়া ছাড়াই দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হলে তোমাকে এ দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে', [সাহীহুল বুখারী ৮/১২৭, নং ৬৬২২, ৯/৬৩, নং ৭১৪৬, সাহীহ মুসলিম৩/১২৭৩, নং ১৬৫২]। তাছাড়াও আবু মুসা আল– আশ'আরী (রা) বর্ণিত হাদীসে দু'জন ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে দায়িত্ব চাইলে তিনি বলেন,

لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

আমি আমাদের কোন দায়িত্ব এমন ব্যক্তির উপর অর্পণ করবো না যে তার আকাঙ্খা করে', [সাহীহুল বুখারী ৩/৮৮, নং ২২৬১, সাহীহ মুসলিম ৩/১৪৫৬, নং ১৭৩৩]। এসব হাদীস থেকে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয়। ইমাম আল– কুরতুবী এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, ইউসূফ ('আ) তো বেলায়াত বা নেতৃত্ব চেয়েছেন এ জন্যে যে, তিনি ভালো করে জানেন, এই মিসর দেশে 'আদল– ইনসাফ কায়েম করা, সমাজ সংস্কার– সংশোধন করা, পুনর্গঠন করা এবং অভাবী, দুস্থ ও বঞ্চিত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মত আর কেউ নেই। সুতরাং তিনি ভেবে ছিলেন যে, এ দায়িত্বের জন্য তার নিজেকে পেশ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। যোগ্যতা ও দক্ষতার বিচারে নিজেকে পেশ করা তার জন্য ফারয ও অত্যাবশ্যক। যেহেতু এ রকম যোগ্য ও দক্ষ লোক আর কেউ নেই, যে ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। বর্তমান সময়ের জন্যও এ বিধানটি কার্যকর রয়েছে। যদি কোন মানুষ নিজের ব্যাপারে এ আত্মবল ও বলিষ্ঠতা থাকে যে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায় সঙ্গত বিচার– ফায়সালা, সুষ্ঠু তত্বাবধায়ন ও সুশাসন ইত্যাদি দায়িত্ব পালনে যোগ্য, দক্ষ ও সক্ষম এবং তার মত অন্য এমন নেই, তাহলে নিজেকে দায়িত্বের জন্য পেশ করা তার জন্য অপরিহার্য। তিনি সে দায়িত্ব চাইবে এবং দায়িত্ব পালন করবে। যাদের হাতে দায়িত্ব দেবার ক্ষমতা ও অধিকার থাকে তাদের কাছে নিজের এসব যোগ্যতা ও দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার কথা তুলে ধরবেন। আর যদি সত্যিই কেউ থাকে তাহলে দায়িত্ব চেয়ে না নেয়াই উত্তম। যেমন 'আব্দুর রাহমান ইবন সামুরার হাদীস থেকে জানা যায় যে, 'তোমরা নেতৃত্ব চেয়ে নেবে না', [দখুন, তাফসীরুল কুরতুবী ৫/২১৫– ২১৬]।

আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী, **وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ** **'আর এভাবে ইউসুফকে আমরা সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছে অবস্থান করতে পারতেন। আমরা যাকে ইচ্ছে তার**

প্রতি আমাদের রহমাত দান করি; এবং আমরা মুহসিনদের পুরস্কার নষ্ট করি না'। অর্থাৎ আল্লাহ ইউসুফ ('আ)কে বাদশাহর দরবারে যেভাবে মান– সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, এমনি ভাবে তিনি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতাও দান করেছেন। এখানে তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী আদেশ জারি করতে পারেন। যার প্রতি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাকে স্বীয় রাহমাত ও করুণা দ্বারা সৌভাগ্যবান করেন এবং তিনি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। এ আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, সমগ্র মিসর দেশটাই ইউসুফ ('আ) এর অধিকার ভুক্ত ও শসানাধীন ছিল। প্রখ্যাত মুফাস্‌সির তাবি'য়ী মুজাহিদ বলেন, এসব প্রভাব– প্রতিপত্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ ('আ) এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর বিধি– বিধান বাস্তবায়ন করা এবং তাঁর দীন কায়েম করা। তিনি কোন সময় এ দায়িত্ব– কর্তব্য ভুলে যাননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে থাকেন। তার অনবরত দা'ওয়াত ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহও মুসলিম হয়ে যান, [তাফসীরুত তাবারী ১৬/১৫১– ১৫২, তাফসীরুল কুরতুবী ৯/২১৭– ২১৮, তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৩৯৬]।মহান আল্লাহ ইউসুফ ('আ)কে মিসরের সর্বময় ক্ষমতা দান করেছিলেন অন্যান্য আয়াত থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا}

'আর তিনি (ইউসুফ) তার পিতা–মাতাকে উঁচু আসনে বসালেন এবং তারা তার জন্য সাজদা করল', [ইউসুফ- ১২: ১০০]। অর্থাৎ তিনি তার পিতা- মাতাকে তার পাশে রাজার আসনে বসালেন। 'আরবী 'আল– 'আরশ' দ্বারা কখনো 'রাষ্ট্র' এবং 'বাদশাহ' উভয়কেই বুঝায়, [তাফসীরুল কুরতুবী ৯/২৬৪]। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইউসুফ ('আ) মিসরের ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনেই ছিলেন। তিনি মিসরের শাসকই ছিলেন। আয়াতের শেষাংশের বক্তব্য প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন যে, তারা সকলেই ইউসুফ ('আ) এর উদ্দেশ্যে সাজদাহ করলেন। এ আয়াত থেকে মুসলিম সমাজে এক বিরাট ও মারাত্মক বিভ্রান্তি রয়েছে যে, বাদশাহ, পীর, সূফী, শিক্ষক ও বড়দের জন্য আদবের সাজদাহ করা বৈধ। একদল লোক তো এ আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে এ ধরনের সাজদাহর বৈধতাও আবিষ্কার করেছে। আসলে বিভ্রান্তিটি সৃষ্টি হয়েছে এ কারণে যে, তারা বর্তমান সময়ের সাজদহার মত ঐ সাজদাহকে অর্থাৎ হাত, হাঁটু, ও ললাট মাঠিতে ঠেকিয়ে দেয়া বুঝেছে বলে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। মূলতঃ সাজদাহর মূল অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র ঝুঁকে পড়া। আর এ অর্থেই সাজদাহ শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম আল–বাগাভী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন, [তাফসীরুল বাগাভী ৪/২৮০]। এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অভ্যর্থনা জানানো বা সালাম করার জন্য সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ার রেওয়াজ প্রাচীন যুগের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এমনকি এখনো অনেক দেশে এটা দেখা যায়। এ ধরনের ঝুঁকে পড়াকেও 'আরবীতে 'সাজদাহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এটাও শারী'য়াতে মুহাম্মাদীতে মানসূখ বা রহিত হয়েছে, [তাফসীরুল কুরতুবী ৯/২৬৫]। এ আলোচনা থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, বর্তমানে ইসলামী শারী'য়াতে যাকে 'সাজদাহ' বলা হয়, এ 'সাজদাহর' অর্থ তা নয়। ইসলামী শারী'য়াতের 'সাজদাহ' আল্লাহ তা'আলা পাঠানো শারী'য়াতে কোনদিনও গায়রুল্লাহর জন্য জায়িজ ছিল না, [কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ১/১২৪৯]। আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্মান প্রদর্শন করে কারো দিকে ঝুঁকে পড়া বা

মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়াও জায়িয নেই। আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল যে,

يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে কিংবা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করে। তখন সে কি তার দিকে ঝুঁকতে পারে? তিনি বললেন, না। লোকটি বলল, সে কি তার সাথে গলায় গলায় মিলতে পারে এবং তাকে চুমো দিতে পারে? তিনি বললেন, না। লোকটি বলল, সে কি তার হাত ধরতে এবং তার সাথে মুসাফাহাহ করতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ', [সুনাতুত তিরমিযী ৪/৩৭২, নং ২৭২৮, মুসনাদ আহমাদ ২০/৩৪০, নং ১৩০৪৪, সুনান ইবন মাজাহ ২/১২২০, নং ৩৭০২, ইমাম আত্- তিরমিযী বলেন, এটা হাসান হাদীস, আলবানীও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তবে কেউ কেউ হাদীসটিকে যা'য়ীফ বলেছেন]। তাই কোন মুসলিম ও অমুসলিম কারো সম্মানে ঝুঁকে পড়া ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ। কেননা রুকু' ও সাজদাহ আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য করা হারাম। আর অপরিপূর্ণ রুকু' অর্থাৎ মাথা সামান্য ঝুঁকে পড়াও এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে এটাও নিষিদ্ধ, [ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১/৩৭৭, শাইখ ইবন বায, প্রশ্নোত্তর, নং ১৩৩৪৮৭, শাইখ ইবন 'উসাইমীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ, ১০৪, প্রশ্ন ৪]। ইসলাম কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সাক্ষাতের জন্য জান্নাতী তাহিয়্যাত বা অভিনন্দন, 'আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ', মুসাফাহা এবং সফর থেকে ফিরে আসলে মু'আনাকাহ করার পদ্ধতিকে শারী'য়াত সিদ্ধ ও বিধি–বদ্ধ করেছে। মুসাফাহা এবং মু'আনাকাহ সাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি আনাস ইবন মালিক (রা)কে বললাম,

أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল? তিনি বলেন, হ্যাঁ', [সাহীহুল বুখারী ৮/৫৯, নং ৬২৬৩, সুনানুত তিরমিযী ৪/৩৭২, নং ২৭২৯]।আল– বারা ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

'যখনই দু'জন মুসলিম ব্যক্তি পরস্পরে মিলিত হয় অতঃপর তারা মুসাফাহা করে, তখন তারা একে অপর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করা হয়', [সুনান আবি দাউদ ৪/৩৫৪, নং ৫২১২, সুনানুত তিরমিযী ৪/৩৭১, নং ২৭২৭, সুনান ইবন মাজাহ ২/১২২০, নং ৩৭০৩, আল–বানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]। আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ যখন পরস্পর মিলিত হতেন তখন মুসাফাহা করতেন আর যখন সফর থেকে আগমন করতেন তখন মু'আনাকা করতেন বা গলায় গলায় মিলাতেন', [আত্– তাবারানী, আল- মু'জামুল আওসাত ১/৩৭, নং ৯৭,

আত্– তাহাবী, শারহ মা'আনিল আসার ৪/২৮১, নং ৬৯০৬, ৬৯০৯, আল– হাফিয ইবনুল মুনযিরী বলেন, হাদীসটির সনদের সকল রাবীই সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিমের রাবী, দেখুন: আলবানী, আসসিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ১/১৫৯]। তাই ইসলামী শারী'য়াতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে সাজদাহ করা, রুকু' করা এমনকি নিচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়া একবারেই নিষিদ্ধ।

ইউসুফ ('আ) এর মিসরের বাদশাহ হওয়ার বিষয়টি আরেকটি আয়াত থেকেও স্পষ্ট হয়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}

'হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা! আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করুন'! [ইউসুফ- ১২: ১০১]। এসব আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইউসুফ ('আ) সমগ্র মিসরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আর তিনি সে সময় আল্লাহ তা'আলার হিকমাত অনুযায়ী যে শারী'য়াত ও বিধি– বিধান তার প্রতি প্রত্যাদেশ ছিল সে বিধানেই দেশ পরিচালনা করেছেন। এর সমর্থনে জারুল্লাহ আয্– যামাখশারী اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ'আমাকে যমীনের ভান্ডারের দায়িত্ব দিন' এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِيَتَوَصَّلَ إِلَى إِمْضَاءِ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى وَإِقَامَةِالْحَقِّ وَبَسْطِ الْعَدْلِ، وَالتَّمَكُّنِ مِمَّا لأَجْلِهِ تُبْعَثُ الأَنْبِيَاءُ إِلى الْعِبَادِ، وَلِعِلْمِهِ أَنَّ أَحَدًا غَيْرَهُ لاَ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ، فَطَلَبَ التَّوْلِيَةَ ابْتِغَاءِ وَجْهِ اللهِ لاَ لِحُبِّ الْمُلْكِ وَالدُّنْيَا.

ইউসুফ ('আ) এর এ কথা বলার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি এ দায়িত্ব অর্জনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর বিধান কার্যকর করা, সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায় ও ইনসাফের সুফল ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করবেন। আর যেসব কাজের জন্য নাবীগণকে মানব জাতির কাছে প্রেরণ করা হয় সেগুলো সম্পন্ন করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করা। তিনি ছাড়া আর কেউ এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না। তাই তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই কেবল এ দায়িত্ব পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রাজত্ব ও বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ দাবী করেননি, [আয্– যামাখশারী, তাফসীরুল কাশ্‌শাফ ২/৪৮২, আর দেখুন, আশ্– শানকীতী, ফাতহুল কাদীর ৩/৪২]। ইতোপূর্বেও বিশিষ্ট মুফাসসির মুজাহিদের একই ধরনের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি ইউসুফ ('আ) এর দা'ওয়াতে বাদশাহ ইসলামও গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতগুলোতে মৌলিকভাবে ইউসুফ ('আ) এর তিনটি গুণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, তিনি 'আমীন' (আমানতদার), 'হাফীয'(সংরক্ষণকারী) এবং 'আলীম' (জ্ঞানী)। ইসলামে এ তিনটি গুণ সাধারণভাবে সকল মু'মিন– মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণাগুণ, বিশেষ করে ইসলামের নেতৃত্বের জন্য এগুলো আরো অধিক গুরুত্ববহ। সকল নাবী– রাসূলেরই এ গুণাগুণ ছিল। আল– কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নাবীদের সেগুণের কথা উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে সর্বশেষ রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণ আমানতদার ছিলেন, কারণ তিনি পরিপূর্ণ মানবীয় গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তার সাথে অন্য কারো তুলনা চলে না। তার অনন্য আমানতদারীতার কারণে রিসালাত প্রাপ্তির পূর্বেই মক্কার লোকেরা তাকে ‘আল–আমীন’ বলে সম্বোধন করেছেন। তারা তার কাছে মুল্যবান সামগ্রী আমানত হিসেবে রাখতেন। যারা তাকে হত্যা করতে তার বাড়ি ঘিরে রেখেছে এমন অবস্থাতেও তিনি তাদের আমানতগুলো হকদারদেরকে পৌছানোর দায়িত্ব ‘আলী (রা)কে দিয়ে তিনি হিজরাতের রাতে ঘর থেকে বের হয়েছেন। তাই আমানতের গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমানতকেই ঈমান বলেছেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

যার আমানত নাই তার ঈমান নেই আর যার প্রতিশ্রুতি নেই তার দীন নেই’, [মুসনাদ আহমাদ ১৯/৩৭৬, নং ১২৩৮৩, সাহীহ ইবন হিব্বান ১/৪২৩, নং ১৯৪, আল–বাইহাকী, আস্- সুনানুল কুবরা ৬/৪৭১, নং ১২৬৯০, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন, কোন কোন গবেষক হাসান বলেছেন]। মহান আল্লাহ হকদারদের কাছে তাদের আমানত আদায় করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا }

‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আমানত এর হকদারকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিচ্ছেন’, [আন্– নিসা– ৪: ৫৮]। আর আমানাতের খিয়ানাত করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ সুবহনাহু বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে– বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খিয়ানত করো না এবং তোমাদের আমানতসমূহেরও খিয়ানত করো না’, [আল– আনফাল– ৮: ২৭]। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত দীন ইসলাম, দীনের দায়িত্ব, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির নেতৃত্বসহ সকল প্রকারের আমানতকেই বুঝায়। আল্লাহ তা‘আলার নাবী– রাসূলগণ এবং নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে যারা অনুসরণ করেছেন তারা সকলেই এই আমানতসমূহ যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, **হিফাযত করা**, অর্থাৎ অর্পিত দায়– দায়িত্ব, বিধি–বিধান, কার্যক্রমসহ যাবতীয় করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো হিফাযত করা ও সংরক্ষণ করা। এ বিষয়টিও আল–কুরআন ও আস্–সুন্নাহতে অনেক গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর বিধি– বিধান, আদেশ নিষেধ এবং করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে পরিপালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে এগুলোর লংঘন ও যথাযথ পালন না করাকে সীমালংঘন, ঔদ্ধ্যত্ব ও স্পর্ধা বলে অভিহিত করা হয়েছে। মু’মিনদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}

‘আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী আর আপনি মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দিন’, [আত্– তাওবাহ– ৯: ১১২]। আয়াতের এ অংশে পূর্বোক্ত সাতটি গুণের সারাংশ হলো এটি। অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রতিটি কাজ, কর্ম ও কথায় আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা ও শারী‘য়াতের বিধি– বিধানের অনুগত ও হিফাযাতকারী। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধকে

আল– কুরআনের ভাষায় 'আল্লাহর হুদূদ' বলা হয়, [ইবন 'আশুর, আত্– তাহরীর ওয়াত্ তানভীর ১১/৪২]। আল্লাহর বিধানাবলীই হচ্ছে, 'আল্লাহর হুদুদ' বা সীমারেখা। মহান আল্লাহ বলেন,

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

'এসব আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা এর লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহর সীমা লংঘন করে তারাই যালিম', [আল– বাকারাহ– ২: ২২৯, আর দেখুন, আন– নিসা– ৪: ১৩]। অন্য আয়াতে আল্লাহর সীমার ধারে কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}

'এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, কাজেই এগুলোর নিকটবর্তীও হয়ো না', [আল– বাকারাহ– ২: ১৮৭]। আল্লাহর হিফাযত বা আল্লাহর বিধানাবলীর হিফাযতের নির্দেশ এবং এগুলো লংঘনের নিষেধাজ্ঞা সাহীহ হাদীসেও উল্লেখিত হয়েছে। ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،

আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে বসা ছিলাম, তখন তিনি বলেন, হে বৎস! আমি নিশ্চয় তোমাকে কতকগুলো কথা শেখাবো; তুমি আল্লাহর হিফাযাত কর তিনি তোমাকে হিফাযাত করবেন। তুমি আল্লাহকে হিফাযাত কর, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য কামনা করবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে', [সুনানুত তিরমিযী ৪/২৪৮, নং ২৫১৬, মুসনাদ আহমাদ ৪/৪০৯- ৪১০, নং ২৬৬৯, আল–বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ১/৩৭৪, নং ১৯২, ইমাম আত্- তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সাহীহ বলেছেন, আলবানী সাহীহ বলেছেন]। 'আল্লাহর হিফাযাত কর' এর অর্থ হচ্ছে, احْفَظْ حُدُودَهُ، وَحُقُوقَهُ، وَأَوَامِرَهُ، وَنَوَاهِيَهُ، অর্থাৎ আল্লাহর সীমারেখা, তাঁর অধিকারসমূহ, নির্দেশাবলী এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর হিফাযাত। তাঁর সকল নির্দেশ পালন করা এবং সব নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা। সুনির্দিষ্টভাবে অনেক আদেশ ও নিষেধের হিফাযাতের নির্দেশ আল–কুরআন ও আস্–সুন্নাতে রয়েছে, যেমন; সালাতের বিশেষ করে মধ্য সালাতের হিফাযাত, শপথের হিফাযাত, জিহ্বার হিফাযাত, লজ্জাস্থানের হিফাযাত, আমানাত ও প্রতিশ্রুতিসমূহের হিফাযাত ইত্যাদি, [দেখুন, ইবন রাজাব, জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪৬১- ৪৬২]।

তৃতীয় গুণটি হচ্ছে, **ইলম বা জ্ঞান অর্জন**, ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। বরং আল–কুরআনের প্রথম আয়াতই নাযিল হয়েছে আল্লাহর নামে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়ে। তাই ইসলামের প্রধান বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর পরিপূর্ণ দীন ও জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে যথাযথ ও অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান থাকা। কারণ কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তার হক আদায় করা সম্ভব নয়। এমনকি তাওহীদের বাণী: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই', এ কথার সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করার পূর্বে এ কালিমা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। এ কারণে ইমাম আল–বুখারী তার সাহীহুল বুখারীতে بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ 'কথা ও কর্মের পূর্বে ইলম অর্জন পরিচ্ছেদ' নামে একটি পরিচ্ছেদের শিরনাম দিয়েছেন

এবং এর দলীল হিসেবে আল্লাহ তা'আলার বাণী,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}

'অতএব জেনে নিন যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই', [মুহাম্মাদ– ৪৭: ১৯] উল্লেখ করেছেন। এরপর ইমাম আল– বুখারী 'ইলম ও 'আলিমগণের গুরুত্ব আল–কুরআন ও আস্– সুন্নাহর দলীল দ্বারা তুলে ধরেছেন, [দেখুন সাহীহুল বুখারী ১/২৪- ২৫]। সর্বশেষ রাসূলসহ আল্লাহর সকল নাবী– রাসূল 'আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম এবং নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসারীগণ অন্যান্য গুণাগুণসহ মৌলিক এ তিনটি গুণ তারা অর্জন করেছেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي}

'আপনি বলুন, এটাই আমার পথ, আল্লাহর দিকে আমি ডাকি জেনে – বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও', [ইউসুফ– ১২: ১০৮]। তাই ইসলাম, ইসলামী সমাজ, মানুষ ও দেশ সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকারের নেতৃত্ব, ইমামত, পরিচালনা, উত্তম নমূনা ও দা'য়ী ইলাল্লাহ হওয়ার জন্য অন্যান্য গুণাগুণের সাথে সাথে মৌলিক এ তিনটি গুণ অর্জন করা, এগুলো নিজেদের মধ্যে থাকা এবং বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে সৎ ও ন্যায়– নিষ্ঠ মানুষের স্বীকৃতিঅর্জন আবশ্যক।

শিক্ষাসমূহ:

আলোচ্য আয়াতগুলোতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে;

এক. সার্বিক জ্ঞান অর্জন করা, অর্থাৎ মৌলিক তিনটি জ্ঞান; আল্লাহ তা'আলা, তাঁর দীন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট, সঠিক জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। আল্লাহর হক, বান্দার হক ও দীনের হক আদায়ের জন্য এ জ্ঞান অর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

দুই. আমানতের বিস্তৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা এবং প্রকৃত আমানতদার হওয়ার মাধ্যমে আমানতদার হিসেবে মানুষের আস্থা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী।

তিন. আল্লাহর সীমারেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা, অর্থাৎ তাঁর সকল ধরনের নির্দেশ পরিপালন করা এবং সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা পরিহার করা। করনীয় হিসবে রাসূলুল্লাহ যা দিয়েছেন তাই করতে হবে আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে হুদূদুল্লাহর হিফাযাতকারী হতে হবে।

মহান করুণাময় আল্লাহ এসব গুণাগুণ অর্জন করার তাওফীক উম্মাতের 'উলামায়ে কিরাম, ইমামগণ, দা'য়ীগণ ও সর্বস্তরের নেতৃত্বসহ সকলকে দান করুন! আমীন!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

দারসুল হাদীস

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

'আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সা.) বলেছেন, নারীরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসে সিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থান হিফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে।[১]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

'আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সা.) বলেছেন, নারীরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসে সিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থান হিফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে তাকে বলা হবে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো।[২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীছ দু'টিতে নারীদের সহজে জান্নাতে যাওয়ার কাজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ চারটি কাজ করলে তারা জান্নাতে যেতে পারবে বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নারীদের জান্নাতে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ নারী এবং পুরুষ স্বভাব ও বৈশিষ্টগতভাবে অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির। এ কারণেই উভয়ের দায়-দায়িত্বও ভিন্ন রকম। পুরুষকে অর্থ উপার্জন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ-জিহাদ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর নারীদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সন্তান লালন পালন, গৃহ পরিচালনা, স্বামীর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিজের হিফাজত করা। নারী পুরুষের প্রত্যেককে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল করা হয়েছে এবং সে জন্য তাদেরকে জবাবদিহিও করতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

১. আল মু'জামুল আওসাত, হাদীছ নং ৮৮০৫।
২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৬১

'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম বা শাসক লোকদের দায়িত্বশীল তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবার পরিজনের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পটর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের এবং সন্তানের দায়িত্বশীলা, তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। কোনো ব্যক্তির দাস (কর্মচারী) তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। জেনো রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে।[৩]

এগুলো হলো মানুষের সামাজিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বগুলো যদি মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর হুকুম মোতাবিক পালন করে, তাহলে এগুলোও 'ইবাদাতে পরিণত হবে।

এ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, সকলের দায়িত্ব এক রকম নয়। বরং ব্যক্তি ও ব্যক্তির পদ মর্যাদার ভিন্নতার করণে দায়িত্বও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে নারী এবং পুরুষের দায়িত্বও এক রকম নয়। বরং ভিন্ন ভিন্ন। দারসের শিরোনামে উল্লেখিত হাদীছ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, পুরুষের দায়িত্ব বহির্মুখী এবং নারীদের দায়িত্ব ঘরমুখী। তবে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন হলে এর যে একেবারেই ব্যতিক্রম করা যাবে না তা নয়। নারী এবং পুরুষ তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যদি আল্লাহর 'ইবাদাত-বন্দেগী যথাযথভাবে আদায় করে, তাহলে তারা আখিরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে।

এ হাদীছে নারীদের জান্নাতে যাওয়ার 'আমলসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো :

১.পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। সালাত সে সকল মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত যে সবের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ এবং রমযান মাসের সিয়াম।[৪] অন্য একটি হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ عِنْدَ اللهِ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

'ইকরামা সুত্রে 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, ইসলামে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় কোন জিনিস? তিনি বললেন, সময়মত (প্রথম ওয়াক্তে) সালাত আদায় করা। যে ব্যক্তি সালাত বর্জন করে তার দ্বীন নেই। আর সালাত হলো দ্বীনের স্তম্ভ।[৫]

এ হাদীছে সালাতকে দ্বীনের স্তম্ভ আখ্যায়িত করার পাশাপাশি সালাত বর্জনকারীর দ্বীন নেই

---

৩. বুখারী, হাদীছ নং ৭১৩৮।
৪. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু কাউলিন নাবিয়্যি (সা.) বুনিয়াল ইসলামু 'আলা খামসিন, হাদীছ নং ৮।
৫. শো'আবুল ঈমান, হাদীছ নং ২৫৫০। আবু 'আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী বলেন, 'ইকরিমা 'উমার (রা.) থেকে হাদীছটি শুনেননি আমার মনে তিনি 'ইবন 'উমার বলতে চেয়েছেন।

বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীছে সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে চরম সতর্কবাণী করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)কে বলতে শুনেছি, আমি নাবী (সা.)কে বলতে শুনেছি, বস্তুত: কোনো ব্যক্তির ও শিরক এবং কুফরীর মাঝে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।[৬]

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كفر

বুরাইদা (রা.) সূত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা মেঘলা দিনে প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করবে। কেননা যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে কুফরী করে।[৭]

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى عُمَرَ حِينَ انْصَرَفَا مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَمَا طُعِنَ فَوَجَدَاهُ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ فَقَالَا: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: نَعَمْ، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

ইবন জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু মুলাইকাকে বলতে শুনেছি, ইবন ‘আব্বাস এবং আল মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) সালাত শেষ করে ‘উমার (রা.) এর নিকট গেলেন। এটা ছিল তিনি (‘উমার রা.) আহত হওয়ার পর। তারা দেখলেন যে, তিনি ফজরের সালাত আদায় করেননি। তারা বললেন, সালাত আদায় করুন। তিনি বললেন, হাঁ, যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে ইসলামে তার কোনো অংশ নেই। অত:পর তিনি ওযু করে সালাত আদায় করলেন, আর তখনও তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরছিলো।[৮]

عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ "

উম্মু আইমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ইচ্ছা করে সালাত পরিত্যাগ করো না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাত ত্যাগ করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী থেকে মুক্ত হয়ে যায়।[৯]

عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

নাওফাল ইবন মু‘আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করল, তার যেন পরিবার-পরিজন ও সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।[১০]

কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেওয়া হবে।

---

৬. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি ইতলাকিল কুফরি ‘আলা মান তারাকাস সালাতা, হাদীছ নং ৮২ (১৩৪)
৭. সহহি ইবন হিব্বান, কিতাবুস সালাত, বাবুল ওয়া‘ঈদি ‘আলা তারকিস সালাত, হাদীছ নং ১৪৬৩।
৮. ‘আব্দুর রাজ্জাক, আল্ মুসান্নাফ, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল জুরহি লা-ইয়ারকায়ু, হাদীছ নং ৫৮০।
৯. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৩৭৩৬৪।
১০. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী, হাদীছ নং ১৩৩৩।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার 'আমলের মধ্যে সর্ব প্রথম তার সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি তা ঠিক থাকে তাহলে সফল হবে এবং নাজাত পাবে। আর যদি তা ঠিক না থাকে তাহলে সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরজ সালাতে কোনো কমতি থাকে তাহলে পরাক্রমশালী মর্যাদাবান রব বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোনো নফল 'আমল আছে কিনা। থাকলে তা দিয়ে ফরজের ক্ষতিপূরণ করে দাও। এরপর তার সকল 'আমলের ব্যাপারে এরূপই হবে।[১১]

দুনিয়াতে সালাত আদায় না করা, আখিরাতে জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ – إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ– فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ – عَنِ الْمُجْرِمِينَ – مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ – قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ – وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ (মুমিন) ব্যক্তিগণ ব্যতীত। তারা জান্নাতে অবস্থান করে পাপীদের ব্যাপারে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে। কিসে তোমাদেরকে সাকারে (জাহান্নামে) প্রবেশ করালো? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না এবং মিসকীনদেরকে খাদ্য খওয়াতাম না। (৭৪, সূরা আল্ মুদ্দাছ্ছির : ৩৮-৪৪)

অপর দিকে নিয়মিত সালাত আদায় জান্নাত লাভের অন্যতম কারণ হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জান্নাতের চাবি হলো সালাত আর সালাতের চাবি হলো ওযু।[১২]

যে সকল মুমিন সফল এবং যারা জান্নাত লাভ করবে, তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো তারা সালাত আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ– الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ...وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ – أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ – الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

সফল সে সব মুমিন, যারা সালাতে বিনয়াবনত।...আর যারা নিজেদের সালাতসমূহ হিফাজত করে। তারাই হবে উত্তরাধিকারী। তারা উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউস (জান্নাতের) যেখানে তারা চির দিন অবস্থান করবে। (২৩, সূরা আল্ মুমিনুন : ১-২, ৯-১১)

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। এটিই ঈমান ও কুফর

---

১১. তিরমিযী, হাদীছ নং ৪১৩।
১২. তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাত, বাবু মা জাআ আন্না মিফতাহুস সালাতি আত্ তুহুর, হাদীছ নং ৪।

এবং মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্যকারী। সালাত পরিত্যাগ জাহান্নামের অন্যতম কারণ হবে। অপরদিকে নিয়মিত সালাত আদায় জান্নাতের অন্যতম কারণ হবে। সুতরাং দুনিয়াতে মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে এবং আখিরাতে জান্নাত লাভের জন্য নারী পুরুষ সকলকেই অবশ্যই নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে।

২. রমযান মাসে সিয়াম পালন : সিয়ামও মৌলিক ফরজ 'ইবাদাতের অন্যতম। রমযান মাসে এ সিয়াম পালন প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নারী পুরুষের উপর অত্যাবশ্যক। সিয়াম অন্যায় অনাচার পরিহার করে সততা ও তাকওয়া সম্পন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য সিয়ামকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তিদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (২, সূরা আল্ বাকারা : ১৮৩)

তাকওয়া বলা হয় অধিক মাত্রায় সতর্ক থাকাকে, যাতে কোনো অন্যায় অনাচার, পাপাচার তাকে স্পর্শ করতে না পারে। যিনি সর্বদা অন্যায় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য অতি মাত্রায় সতর্ক ও সচেতন থাকেন, তিনিই মুত্তাকী। পরিভাষায় মুত্তাকী বলা হয়, **من يقى نفسه عما يضره قى الاخرة** যে ব্যক্তি নিজেকে এমন সকল কাজ থেকে বিরত রাখে, যা আখিরাতে ক্ষতির কারণ হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সিয়াম হলো ঢাল।[১৩] অর্থাৎ দুনিয়ায় শয়তানের অনিষ্ট এবং আখিরাতে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সিয়াম ঢাল স্বরূপ।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, **الصَّوْمُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ يَخْرِقْهَا** সিয়াম হলো ঢাল, যতক্ষণ না তা ভেঙ্গে ফেলে। অর্থাৎ গীবৎ ইত্যাদি দ্বারা সিয়ামের ক্ষতি সাধন না করে।[১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

আবু হুরাইরা (রা) সূত্রে নাবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কদরের রাত্রি জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সংগে এবং ছওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। [১৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ "

---

১৩. সুনানুদ দারিমী, কিতাবুস সাওম, বাবু ফী ফাজলিস সিয়াম, হাদীছ নং ১৮১২।
১৪. সুনানুদ দারিমী, কিতাবুস সাওম, বাবুস্ সায়িমি ইয়াগতাবু ফাইয়খরিকু সাওমাহু, হাদীছ নং ১৭৭৩।
১৫. বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাবু মান সামা রামাযা ঈমানাও ওয়া ইহতিসাবাও ওয়া নিয়্যাতান, হাদীছ নং ১৯০১।

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আদম সন্তানের কাজের বদলা দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন, সিয়াম এর ব্যতিক্রম। কেননা সিয়াম আমারই জন্য, আর আমি নিজেই এর বদলা দেব। বান্দা আমার কারণেই কামনা বাসনা ও আহার বর্জন করে থাকে। সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ। একটি আনন্দ হলো ইফতারের সময়, আর অন্য আনন্দটি হলো তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। আর অবশ্যই তার (সিয়াম পালনকারীর) মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়।"[১৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ، إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ

"'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সিয়াম এবং আল কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে প্রভু, আমি তাকে দিনের বেলায় আহার ও কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। আর আল কুরআন বলবে, হে প্রভু, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। তখন দু'টি সুপারিশই গ্রহণ করা হবে।"[১৭]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ»

সাহল ইবন সা'দ (রা.) সূত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জান্নাতে আটটি দরজা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি দরজার নাম আর্ রায়্যান। তাতে সিয়াম পালনকারীগণ ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সিয়ামের প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। এর দ্বারা তাকওয়া অর্জন হয়, গুনাহ মাফ হয়, প্রভূত ছওয়াব লাভ হয়, আল্লাহর নিকট সুপারিশের সৌভাগ্য লাভ হয় এবং জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করা যায়। সুতরাং সিয়াম পালনের ব্যাপারে সকল নারী পুরুষকে অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে।

৩. ইজ্জত আব্রুর হিফাজত করা : নারীদের জান্নাতে যওয়ার জন্য তৃতীয় কাজটি হলো নিজের লজ্জাস্থানের হিফাজত করা। অর্থাৎ বেহায়াপনা, অশ্লীলতা প্রভৃতি বর্জন করে শালীন ও সভ্য জীবন যাপন করা, সঠিকভাবে পর্দা প্রতিপালন করা, যিনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"হে নাবী, মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে এবং যা সাধারণত প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" (২৪, সূরা আন্ নূর : ৩১) সতী-সাধ্বী নারীগণ তাদের ইজ্জত আব্রু ও লজ্জাস্থানকে সযত্নে হিফাজত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৬. মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ফাজলিস সিয়াম, হাদীছ নং ১১৫১ (১৬৪)।
১৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬৬২৬।

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"সৎকর্মপরায়ণ স্ত্রীগণ হন (স্বামীর) অনুগত, (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করেছেন তার হেফাজতকারী।" (৪, সূরা আন্ নিসা : ৩৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রশীদ রিজা (রহ) বলেন, পৃথিবীতে দু'ধরনের নারী রয়েছে, সৎ এবং অসৎ। সৎ নারীদের বৈশিষ্ট হলো, তারা আল্লাহর অনুগত এবং অনুরূপভাবে সৎ কাজের ক্ষেত্রে স্বামীর অনুগত। আর তারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের ও স্বামীর সম্পদের হিফাজত করে।[১৮]

এ ধরনের নারীরাই হলেন উত্তম নারী। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُعْطِيكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ»

'আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, উত্তম নারী (স্ত্রী) সে যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে সন্তুষ্ট করে, তুমি নির্দেশ দিলে তোমার আনুগত্য করে এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তার নিজের ও তোমার সম্পদের হিফাজত করে।[১৯] এ ধরনের নাররীগণ হন কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলা। তাদের ব্যাপারে নাবী (সা.) বলেন,

وَإِنَّ خَيْرَ النِّسَاءِ الَّتِي إِنْ أُعْطِيَتْ شَكَرَتْ، وَإِنْ أُمْسِكَ عَنْهَا صَبَرَتْ

"আর উত্তম নারী হলেন তারা, যাদেরকে কোনো কিছু দেওয়া হলে কৃতজ্ঞতা জানায় এবং না দিলে ধৈর্যধারণ করে।"[২০]

সৎকর্মপরায়ণ নারীগণকে হাদীছে দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুনিয়া সম্পদ সমৃদ্ধ। আর দুনিয়ার সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সৎকর্মপরায়ণ নারী।[২১]

এ ধরনের নারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষগণ ও মুসলিম নারীগণ, ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীগণ, অনুগত পুরুষগণ ও অনুগত নারীগণ, সত্যবাদী পুরুষগণ ও সত্যবাদী নারীগণ, ধৈর্যশীল পুরুষগণ ও ধৈর্যশীল নারীগণ, বিনীত পুরুষগণ ও বিনীত নারীগণ, দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ, রোযাদার পুরুষগণ ও রোযাদার নারীগণ, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষগণ ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারীগণ, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষগণ ও

---

১৮. মুহাম্মদ রশীদ রিজা, তাফসীরুল মানার,খ. ৫, পৃ.৫২।
১৯. আল মু'জামুল কাবীর, হাদীছ নং ৩৮৬।
২০. জামি' মা'মার ইবন রাশেদ, হাদীছ নং ২০৫৯৪।
২১. মুসলিম, কিতাবুর রিজা', বাব খাইরু মাতা'আদ্ দুনইয়া আল্ মারয়াতুস সালিহা, হাদীছ নং ১৪৬৭ (৫৯)।

অধিক স্মরণকারী নারীগণ, এদের সকলের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৩৩, সূরা আল্ আহযাব : ৩৫)

এ সকল নারীগণই হবেন আখিরাতে জান্নাতের অধিকারিনী। আল্লাহ ত'আলা জান্নাতী নারী পুরুষদের বৈশিষ্ট বর্ণনা দিয়ে বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (২৩, সূরা আল্ মুমিনুন : ৫)

সুতরাং প্রত্যেক নারীকে যথাযথভাবে পর্দা প্রতিপালন, নিজের সতীত্ব সংরক্ষণ এবং স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণে সদা যত্নশীল হতে হবে, তাহলে তাদের জন্য জান্নাত লাভ সহজ হবে।

৪. স্বামীর আনুগত্য করা : হাদীছে সালাত, সিয়াম পালন এবং লজ্জাস্থানের হিফাজতের সাথে জান্নাতে যাওয়ার কারণ হিসেবে স্বামীর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সালাত, সিয়াম, পর্দা পালন প্রভৃতির ন্যায় নারীদের জন্য স্বামীর আনুগত্য করা অত্যাবশ্যক, যদি তা আল্লাহর অবাধ্যতা না হয়। স্বামী সাধারণত পরিবারের কতৃত্ব করে থাকেন। সকল ক্ষেত্রে কারো না কারো আনুগত্য করতে হয়। যেমন দেশের নাগরিকদেরকে প্রধান মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির আনুগত্য করতে হয়, কোনো অফিসের সকলকে সে অফিসের প্রধান ব্যক্তির আনুগত্য করে চলতে হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধানের আনুগত্য করতে হয়। অনুরূপভাবে পরিবারও একটি প্রতিষ্ঠান, সুতরাং তার প্রধানকেও পরিবারের অন্যান্যদেরকে মেনে চলতে হবে। অন্যথায় পরিবারে বিশৃংখলা তৈরী হবে এবং শান্তি বিনষ্ট হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে সন্তানাদিসহ পরিবারের সকলেই স্বতস্ফুর্তভাবে পরিবারের কর্তাকে মেনে চলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তম নারীদের যে বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন, তার অন্যতম হলো, وَتُطِيعكَ إذا أَمَرْتَ যখন তুমি আদেশ করো তখন সে আনুগত্য করে।[২২] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلِّهِ حَتَّى إِنْ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ أَعْطَتْهُ أَوْ قَالَ لَمْ تَمْنَعْهُ

যদি আমি কোনো ব্যক্তিকে অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য সিজদা করতে বলতাম, তাহলে আমি অবশ্যই স্ত্রীকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সেজদা করতে। আমার জীবন যার হাতে তার শপথ, স্ত্রী তার মহান রবের হক আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর সকল হক আদায় করে। এমন কি স্বামী যদি (সহবাসের জন্য) ডাকে তাহলে তার আনুগত্য করতে হবে অথবা তাকে বাধা দেবে না যদিও সে উটের রেহালের উপর থাকে।[২৩] অন্য হাদীছে নাবী (সা.) এরশাদ করেন,

اثنان لا تُجاوِزُ صلاتُهُما رُؤوسَهما عبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ وامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَها حَتَّى تَرجِعَ

দুই ব্যক্তির সালাত তাদের মাথা অতিক্রম করে না : যে ক্রীতদাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে যায়, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে এবং সেই স্ত্রী যে তার স্বামীর অবাধ্য হয়, যতক্ষণ না (অবাধ্যতা) থেকে ফিরে আসে।[২৪] একটি হাদীছে রয়েছে,

---

২২ . আল মু'জামুল কাবীর, হাদীছ নং ৩৮৬।

২৩. বায়হাকী, আস সুনানুল কাবীর, হাদীছ নং ১৫১০৮।

২৪. হাকিম, আল মুস্তাদ্‌রাক 'আলাস সাহীহাইন, হাদীছ নং ৭৩৩০।

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে (সহবাসের জন্য) বিছানায় ডাকে এবং স্ত্রী যদি অস্বীকৃতি জানায় এমতাবস্থায় স্বামী যদি তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত যাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার প্রতি লা'নত করতে থাকে।[২৫]

যে সকল স্ত্রী স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়, তারা জাহান্নামী হবে বলে হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। নাবী (সা.) বলেন,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

হে নারী সমাজ, তোমরা সাদকা করো, কেননা তোমাদের বেশী লোককে জাহান্নামী হিসেবে আমাকে দেখানো হয়েছে। তারা বলল, কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দাও এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা করো।[২৬]

সুতরাং প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো স্বামীর আনুগত্য করে চলা, যদি তা আল্লাহর নাফরমানি না হয়।

ড. আবু তাবাসসুম

---

২৫ . বুখারী, হাদীছ নং ৩২৩৭।

২৬. বুখারী, হাদীছ নং ৩০৪।

চিন্তাধারা

সুন্নাহ্‌র আলোকে জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের স্থান

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ ও মানুষের নিকট জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে কুরআনুল কারীমে বহু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহুসংখ্যক হাদীছ এসেছে। এ সকল হাদীছে 'আলিম তথা জ্ঞানী ব্যক্তিদের এত অত্যুচ্চ মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে যে সেখানে পায়ের উপর ভর করে কিংবা ডানা দিয়ে উড়ে যাওয়া যায় না। সেখানে উঠা যায় কেবল 'ইলম বা জ্ঞানের সাহায্যে। জ্ঞান, জ্ঞানার্জন, শিক্ষাদান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্পর্কে যত আয়াত ও হাদীছ এসেছে তা বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভূমিকা যৎকিঞ্চিত আলোচনা করা।

জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা অনেক। আর এ ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ নেই যে, সর্বোত্তম জ্ঞান হলো 'ইলমে দীন'। যার দ্বারা মানুষ নিজেকে যেমন চিনতে পারে, তেমনি চিনতে পারে আল্লাহকে। তা দ্বারা মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, পথ খুঁজে পায় এবং জানতে পারে কী তার জন্য কল্যাণকর এবং কী ক্ষতিকর। তাছাড়া প্রত্যেক জ্ঞান এমন গূঢ় রহস্য উন্মোচন করে যা মানুষকে সত্যের পথ দেখায় অথবা তাদেরকে কল্যাণের নিকটবর্তী করে, অথবা তাদের জন্য যা মঙ্গলজনক তা বাস্তবায়ন করে এবং যা ক্ষতিকর তা দূরীভূত করে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :[১]

مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْرًا, يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ.

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বুৎপত্তি ও গভীর জ্ঞান দান করেন। তিনি আরো বলেন :[২]

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কিছু পথ অতিক্রম করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি ঘরে যখন কোন একটি সম্প্রদায় বা দল সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং পরস্পর পাঠ করে শোনায় তখন ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে ঘিরে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, দয়া-অনুগ্রহ তাঁদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর পাশে যাঁরা আছেন তাঁদের নিকট এদের বিষয় আলোচনা করেন।

---

১. আল-হায়ছামী, মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ. ১২১; সুনান ইবন মাজাহ্‌, খ. ১, পৃ.৪৯, হাদীছ নং ৬১৫
২. সহীহ্‌ মুসলিম, কিতাবুয যিক্‌র ওয়াদ. দু'আ, হাদীছ নং ২৬৯৯

তিনি আরো বলেন :[৩]

إنَّ الملائِكَةَ لتَضعُ أجنحتَها لطالِبِ العلمِ رضًا بما يصنعُ وإنَّ العالمِ ليستغفِرُ لَهُ مَن في السَّمواتِ ومن في الأرضِ ، حتَّى الحيتانِ في الماءِ ، وفضلَ العالمِ على العابدِ كفَضلِ القمرِ على سائرِ الكواكبِ ، وإنَّ العُلَماءَ ورثةُ الأنبياءِ إنَّ الأنبياءَ لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا إنَّما ورَّثوا العلمَ فمَن أخذَهُ أخذَ بحظٍّ وافرٍ.

ফেরেশতাকুল শিক্ষার্থীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য নিজেদের ডানা মেলে দেয়, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলে, এমনকি পানির মধ্যে মাছও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। 'আবিদ ব্যক্তির উপর 'আলিম ব্যক্তির মর্যাদা এমন অত্যুজ্জল যেমন নক্ষত্ররাজির উপর চাঁদের অত্যুজ্জল মর্যাদা। 'আলিমগণ আম্বিয়ায়ে কিরামের ওয়ারিছ তথা উত্তরাধিকারী। আর আম্বিয়ায়ে কিরাম উত্তরাধিকার হিসেবে দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যান না, তাঁরা 'ইলম তথা জ্ঞান রেখে যান। যে তা গ্রহণ করে সে পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

এ সকল হাদীছ 'ইলম তথা জ্ঞানের অতুচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করছে। বিশেষত: দীনী 'ইলম, যাকে হাদীছের ভাষায় الفقه فى الدين (দীনের তত্ত্বজ্ঞান) বলা হয়েছে। العلم بالدين (দীনী 'ইলম) এবং الفقه فى الدين (দীনের তত্ত্বজ্ঞান) দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। الفقه فى الدين অন্যটির চেয়ে অধিক গভীর ও বিশেষত্বপূর্ণ। 'ইলম হলো কেবলমাত্র বাহ্যিক ভাবে জানার নাম, আর আল-ফিক্হ হলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তর উভয় ভাবে জানা।

উল্লেখিত হাদীছ দু'টি দ্বারা বুঝা যায় 'তালিবুল 'ইলম' তথা জ্ঞান অন্বেষণকারীকে ফেরেশতাগণ সম্মান করে, ভালোবাসে ও সাহায্য করে। তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য ফেরেশতাগণ নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে প্রশান্তি, দয়া ও করুণা বর্ষিত হয় এবং আ'লা 'ইল্লীয়্যীনে আল্লাহ তাদের কথা স্মরণ করেন।

আল কুরআনের বহু আয়াতের পাশাপাশি উল্লেখিত হাদীছ দু'টির মত বহু হাদীছ বিদ্যমান আছে যা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ, তাবি'ঈন, তাবি'-তাবি'ঈন তথা মুসলিম উম্মাহকে যুগ যুগ ধরে জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সেবক ও পৃষ্ঠপোষক হতে যেমন উৎসাহিত করেছে তেমনি জ্ঞান অন্বেষণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ এবং মূর্খতার গ-ানি থেকে সতর্ক করেছে। 'উমার ইবন আল খাত্তাব (রা) বলতেন :[৪]

أيُّها الناس! عليكم بطلب العلم فإنَّ لله رداء محبة, فمن طلب بابامن العلم, ردَّاه الله بردائه ذاك.

ওহে জনমণ্ডলী! আপনাদের জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য। কারণ, আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসার একটি চাদর আছে। যে ব্যক্তি জ্ঞানের কোন একটি অধ্যায় অর্জন করবে, আল্লাহ তার দেহে সেই চাদর পেঁচিয়ে দেবেন।

একবার এক ব্যক্তি ইবন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট জিহাদ সম্পর্কে জানতে চান। তিনি লোকটিকে বলেন :[৫]

ألا أدلك على ما هو خيرلك من الجهاد؟ تبنى مسجداً تعلم فيه القرآن و سنن النبى ﷺ, و الفقه فى الدين.

---

৩. আবূ দাউদ, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ নং-৩৬৪১; তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ নং-২৮৬৩, মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ১৯৬

৪. ইবনু 'আবদিল বার, জামি'উ বায়ান আল-'ইলম, খ. ১, পৃ. ৭০

৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩, ৭৪

আমি কি তোমাকে জিহাদ থেকেও উত্তম জিনিসের কথা বলবো? তুমি একটি মাসজিদ বানাবে এবং সেখানে (মানুষকে) আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ্ ও দীনের ফিক্হ (বিধি-বিধান) শিক্ষা দেবে।

ইবন মাস'উদ (রা) বলেন :[৬]

نِعْمَ الْمَجْلِسُ مَجْلِسٌ تنشر فيه الحكمة, و تنشر فيه الرحمة يعنى مجلس العلم.

সেই মাজলিস কতনা ভালো যেখানে জ্ঞানের প্রচার হয় এবং করুণা ও দয়ার প্রসার ঘটে। অর্থাৎ জ্ঞান চর্চার মাজলিস। মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন:[৭]

تَعَلَّمُوا العِلْمَ, فإنَّ تَعَلُّمَه لله خشية, وطلبه عبادة, ومدارسته تسبيح, والبحث عنه جهاد, وتعليمه من لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة, وهو الأنيس فى الوحدة, والصاحب فى الخلوة, والدليل على الدين, والنصير على السراء والضراء, والوزير عند الأخلاء, والقريب عند القرباء, ومنار سبيل الجنة, يرفع الله به أقوامًا, فيجعلهم فى الخير قادة سادة هداة يقتدي بهم أدلة فى الخير تقتفى آثارهم, وترمق أفعالهم, ترغب الملائكة فى خلتهم وبأجنحتها تمسحهم, وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان البحر وهوامه, وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها... إلى أن قال : به يطاع الله, وبه يعبد, وبه يوحد, وبه يمجد وبه يتورع, وبه توصل الأرحام, وبه يعرف الحلال والحرام. وهو إمام والعمل تابعه ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.

তোমরা জ্ঞানার্জন কর। কারণ, জ্ঞানার্জন করা হলো আল্লাহভীতি, জ্ঞানের অন্বেষণ হলো 'ইবাদাত, পঠন-পাঠন হলো তাসবীহ্ পাঠ, গবেষণা হলো জিহাদ, যে জানেনা তাকে শিক্ষাদান হলো সাদাকা, উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য তা ব্যয় করা হলো নৈকট্য, সেটি একাকীত্বে সঙ্গী, নির্জনে বন্ধু, দীনের ব্যাপারে পথ প্রদর্শক, স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটনে সাহায্যকারী, বন্ধুদের সাথে অবস্থানকালে মন্ত্রণাদাতা এবং ঘনিষ্ঠজনদের সাথে থাকার সময় অতি ঘনিষ্ঠ। এই জ্ঞান জান্নাতের পথের আলোকবর্তিকা। আল্লাহ এর দ্বারা বহু জাতিকে উন্নত করেন এবং সত্য ও কল্যাণে তাদেরকে নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শকের আসন দান করেন। ফলে কল্যাণের পথে জ্ঞানী ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয় এবং তাদের কর্ম ও আচরণ গভীরভাবে তাকিয়ে দেখা হয়। ফেরেশতামণ্ডলী তাদেরকে ভালোবাসে এবং ডানা দিয়ে তাদেরকে স্পর্শ করে। সতেজ ও শুষ্ক সকল বস্তু তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি সাগরের সকল প্রকার মাছ ও ডাঙ্গার হিংস্র ও গৃহপালিত জীবজন্তু এবং আকাশ ও তার তারকারাজি তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে। .... এমনকি তারা বলে: এই জ্ঞান দ্বারাই আল্লাহর আনুগত্য ও 'ইবাদাত করা হয়। এর দ্বারাই আল্লাহর একত্ব, মহত্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করা হয়। এর দ্বারাই তাকওয়া-পরহেযগারি অবলম্বন করা হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা হয়, হালাল-হারাম চেনা যায়। জ্ঞান হলো ইমাম তুল্য, 'আমল তার অনুসারী। সৌভাগ্যবানরা ঐশী প্রেরণার মাধ্যমে তা লাভ করে, আর হতভাগারা তা থেকে বঞ্চিত হয়।

আল-হাসান আল-বসরী বলেন:

لَوْ لاَ الْعُلَمَاءُ لَصَارَ النَّاسُ مِثْلَ الْبَهَا ئِمِ.

জ্ঞানীব্যক্তিগণ যদি না থাকতেন তাহলে মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত হয়ে যেত।

---

৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০
৭. ড. ইউসুফ আল-কারদাবী, আর-রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ. ১৪

অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে পশুত্বের সীমা থেকে বের করে মনুষ্যত্বের সীমায় নিয়ে আসেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবন মু'আয (রহ) বলেন:

العلماء أرحم بأمة محمد ﷺ من آبائهم وأمهاتهم.

'আলিম তথা জ্ঞানীগণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের প্রতি তাদের পিতা-মাতা থেকেও বেশি দয়াশীল।

প্রশ্ন করা হলো: কিভাবে? বললেন:

لأن أبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة.

কারণ তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করেন, আর তাঁরা অর্থাৎ 'আলিমগণ তাদেরকে আখিরাতের আগুন থেকে রক্ষা করেন।

'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ)-কে প্রশ্ন করা হলো: মানুষ কারা? বললেন: 'আলিমগণ। আবার প্রশ্ন করা হলো: রাজা-বাদশাহ কারা? বললেন: যাহিদ তথা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ ব্যক্তিগণ।"[৮]

ইমাম আল-গাযালী (রহ) বলেন: "আলিম ব্যতীত অন্যদেরকে মানুষ গণ্য করা হয়নি। কারণ, যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের দরুণ মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে পৃথক হয়ে যায় তা হলো 'ইলম তথা জ্ঞান। মানুষ তার জ্ঞানের মর্যাদার কারণেই মানুষ, দৈহিক শক্তির কারণে নয়। উট তো তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। আকার-আকৃতির কারণেও নয়, হাতী তো মানুষের চেয়েও বিশাল আকৃতির। বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্যও নয়। হিংস্র বন্য জন্তু তো তার চেয়ে বেশি সাহসী। বেশি আহারের জন্যও মানুষ মানুষ নয়। কারণ, গরুর পেট মানুষের পেটের তুলনায় বিশাল আকৃতির। আর মানুষ এজন্যও মানুষ নয় যে সে বেশি যৌনকর্মে পারঙ্গম। কারণ, অতি নগণ্য চড়ুই পাখিটিও এক্ষেত্রে মানুষের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। মানুষকে এ সবকিছুর জন্য নয়, বরং কেবল 'ইলম তথা জ্ঞানের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৯]

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন:

حاجة الإنسان ألى العلم أكثر من حاجة إلى الطعام.

খাদ্য ও পানীয়ের চেয়ে মানুষের বেশি প্রয়োজন জ্ঞানের।[১০]

মু'আল্লিম তথা শিক্ষককে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর শিক্ষার্থীদের মন-মগযে একথা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছেন যে, শিক্ষকই হলেন সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। আল্লাহর নিকট তাঁরা উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা মানব জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এ কারণে আল্লাহ ও সৃষ্টিকুলের নিকট শিক্ষকের মর্যাদা অত্যুচ্চে। তাই সৃষ্টিকুল শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ ও ইসতিগফার করে। তিনি সাহাবীদেরকে বলেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

---

৮. ইমাম আল-গাযালী, ইয়াহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, খ. ১, পৃ. ৭

৯. প্রাগুক্ত

১০. আর রাসূলু ওয়াল 'ইলম, পৃ. ১৫

নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিবাসীগণ, এমনকি গর্তে অবস্থানরত পিঁপড়ারা এবং মাছ পর্যন্ত মানুষকে সৎ ও কল্যাণের কথা শিক্ষাদানকারীদের জন্য অবশ্যই দু'আ ও ইসতিগফার করে।[১১]

একজন শিক্ষকের এর চেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার কথা পৃথিবীর আর কোন মনীষী শিখিয়েছেন বলে জানা যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে আরো শিখিয়েছেন:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيعلمهَا.

দু'টি জিনিস ছাড়া আর কোন কিছুর জন্য ঈর্ষা করা ঠিক নয়; একজন মানুষ, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন এবং সঠিক পথে তা ব্যয় করার ক্ষমতাও দান করেছেন। আরেকজন মানুষ, আল্লাহ তাকে জ্ঞান দিয়েছেন, তা দিয়ে সে সঠিক বিচার করে এবং সে জ্ঞান অন্যকে শেখায়।[১২]

হাদীছে উল্লেখিত حسد (হিংসা) শব্দটি غبطةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, حَسَد (হাসাদ) হলো নিজের কোন লাভ হোক বা না হোক অন্যের সুখ-সমৃদ্ধির ধ্বংস কামনা করা। আর غِبْطَةٌ (গিবতা) হলো অন্যেরটা ধ্বংস কামনা না করে তার মত সুখ-সমৃদ্ধি নিজের জন্যও কামনা করা। একজন কৃতজ্ঞ বিত্তশালী ও শিক্ষক 'আলিম সত্যিই ঈর্ষার পাত্র। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাও শিখিয়েছেন, জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে যে সাদাকা করা হয় তা অর্থ-সম্পদ, সাদাকার চেয়ে উত্তম। আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

উত্তম সাদাকা হলো, একজন মানুষ কোন জ্ঞান শিখবে এবং তা তার একজন মুসলিম ভাইকে শেখাবে।[১৩] তিনি আরো বলেন:

مَا مِنْ رَجُلٍ تَعَلَّمَ كَلِمَةً، أَوْ كَلِمَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ، فَيَتَعَلَّمُهُنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

যে কোন মুসলিম আল্লাহ যা কিছু ফরজ করেছেন তার একটি, দু'টি, তিনটি, চারটি অথবা পাঁচটি কথা শিখবে এবং সেগুলো অন্যকে শেখাবে, বিনিময়ে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৪] তিনি আরো বলেছেন:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

তোমাদের মধ্যে যে কুরআন শেখে এবং তা অন্যকে শেখায়, সেই উত্তম।[১৫]

এ কারণে আবূ হুরাইরা (রা) বলতেন:

فما نسيت حديثا بعد إذ سمعتهن من رسول الله صلى عليه وسلم.

---

১১. জামি'আত তিরমিযী, হাদীছ নং-২৬৮৩

১২. আল বুখারী, বাবুল ইগতিবারি ফিল 'ইলম ওয়াল হিকমাতি, হাদীছ-৭১; জামি'উ বায়ান আল 'ইলম, খ. ১, পৃ. ১৭; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৭৭, হাদীছ নং-৭৭

১৩. ইবন মাজাহ, ফিল মুকাদ্দিমা, হাদীছ নং-২৪৩; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৬৭, হাদীছ নং-৭৬

১৪. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৬৬, হাদীছ নং-৭৫

১৫. আল বুখারী ও তিরমিযী, ফী ফাদায়িলিল কুরআন

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ থেকে শোনার পর একটি হাদীছও ভুলিনি।[১৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে একথা শিখিয়েছেন যে, একজন শিক্ষকের নিকট থেকে যত মানুষ শিখবে এবং সেই জ্ঞান দ্বারা যত মানুষ উপকৃত হবে তাদের সকলের প্রতিদানের সমান প্রতিদান সে লাভ করবে। তিনি বলেন:[১৭]

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ, فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ .

কোন ব্যক্তি কোন ভালো কাজের পথ দেখালে, কেউ সে কাজ করলে সে তার সমান প্রতিদান পাবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জ্ঞান, জ্ঞান চর্চাকারী এবং যে জ্ঞানদান করে তার মর্যাদার কথা সাহাবায়ে কিরামের (রা) সামনে তুলে ধরে তাঁদেরকে উৎসাহিত করেছেন। এখানে তেমন একটি হাদীছ তুলে ধরা হলো:

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[১৮]

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعلم كَمثل الْغَيْث الْكثير أَصَابَ أَرضًا فَكَانَ مِنْهَا نقيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاس فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَت مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও 'ইলম দান করে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো সেই মূষলধারার বর্ষণের মত, যা ভূমিতে পড়ে, অতঃপর সেই ভূমির একটা পরিচ্ছন্ন অংশ পানি শোষণ করে নেয়। তারপর সেখানে প্রচুর ঘাস ও লতাগুল্ম জন্মায়। সেই ভূমির অপর একটি অংশ উদ্ভিদ অঙ্কুরণের অনুপযোগী, তবে তা পানি ধরে রাখে। আল্লাহ সেই পানি দ্বারা মানুষের উপকার করেন। মানুষ সেই পানি পান করে, অন্যদেরকে পান করায় এবং তা কৃষিকাজে লাগায়। সেই ভূমির আরেকটি অংশ হলো প্রস্তরময় প্রান্তর ও পাহাড়-পর্বত, যা পানি ধরে রাখেনা এবং সেখানে উদ্ভিদও গজায় না। এ হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দীন ভালোমত বুঝেছে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা তার উপকারে এসেছে। তা সে নিজে শিখেছে ও অন্যকে শিখিয়েছে। আর সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে 'ইলম ও হিদায়াত আসার পর মূর্খতা থেকে মাথা উঁচু করে তাকায়নি এবং আল্লাহর হিদায়াত যা সহকারে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কবুল করেনি।

উল্লেখিত হাদীছে চমৎকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে:

১. নুবুওয়াতী 'ইলমকে মুষলধারার বৃষ্টি বলা হয়েছে। কারণ দু'টিরই রয়েছে প্রাণদান ক্ষমতা। বৃষ্টি মৃত ভূমিকে জীবন্ত করে, তেমনিভাবে 'ইলম তথা জ্ঞান-বুদ্ধিও অন্তরকে অজ্ঞতারূপ মৃত্যুর পর জীবন্ত করে।

২. 'ইলম ও হিদায়াতের সংগে মানুষের সম্পর্ক হলো বৃষ্টির সংগে ভূমির সম্পর্কের মত।

---

১৬. আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৬৬, হাদীছ নং-৭৭

১৭. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, হাদীছ-১৮৯৩; আবূ দাউদ, বাবুল আদাব, হাদীছ-৫১২৯

১৮. আল বুখারী, বাবু ফাদলি মান 'আলিমা ওয়া 'আল্লামা; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ৬৮, হাদীছ নং-৬৮

৩. যে ভালো ভূমি পানি শুষে নেয়, তা দ্বারা সে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং প্রচুর ঘাস, লতাগুল্ম জন্মায়, তার উপমা হলো সেই জ্ঞানী লোকটির মত যে 'আলিম শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে। তা দ্বারা সে নিজে উপকৃত হয় এবং অন্যদেরকে উপকৃত করে।

৪. আর যে ভূমি পানি ধরে রাখে তা যেন হাউজের মত যাতে পানি গড়িয়ে যেতে না পারে, কেবল পানি ধরে রাখে, যাতে যে ইচ্ছা করে পান করবে, অন্যকে পান করাবে ও কৃষিতে সেচ দেবে; তার উপমা হলো সেই জ্ঞানীর মত যে জ্ঞান মুখস্থ রাখে, অন্যের জন্য বহন করে, যদিও সে তার গভীর উপলব্ধি রাখে না, তা থেকে গবেষণা করে নতুন কিছু বের করে না।

৫. তৃতীয় প্রকারের ভূমি যা একেবারে নিকৃষ্ট, যা পানি দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অন্যের জন্যেও সংরক্ষণ করে না, তার উপমা সেই সকল মানুষের মত যারা 'ইলম ও হিদায়াত প্রত্যাখ্যান করে। তারা জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না, অন্যের উপকার করে না, জ্ঞান সংরক্ষণ করে না এবং বোঝেও না। তারা 'ইলম বর্ণনাকারীদের কেউ নয়, গভীর তাৎপর্য উপলব্ধিকারীদেরও কেউ নয়।[১৯]

তিনি আরো বলেছেন, 'ইলম অনুযায়ী 'আমলকারী ও অন্যকে অর্জিত 'ইলম শিক্ষাদানকারী ব্যক্তিই হলো সত্যিকার অর্থে নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরাধিকারী।

একজন মু'আল্লিমের সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেকে মু'আল্লিম বলে অভিহিত করেছেন। ইবন 'উমার (রা) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে:[২০]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ وَأَحَدُ الْمَجْلِسَيْنِ يَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ وَالْآخَرُ يَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَيُعَلِّمُونَهُ ، فَقَالَ : " كِلَا الْمَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَعْلَمُونَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا " ثُمَّ جَلَسَ مَعَهُمْ.

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাসজিদে অনুষ্ঠানরত দু'টি মাজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি মাজলিসে আল্লাহর নিকট দু'আ-ইসতিগফার ও তাঁর নিকট আশা-আকাংখা ব্যক্ত করা হচ্ছিল। আর অন্যটিতে চলছিল দীনের বিধি-বিধান শেখা ও শেখানোর কাজ। তিনি মন্তব্য করলেন: দু'টি মাজলিসেই ভালো কাজ হচ্ছে। তবে একটি অপরটির চেয়ে বেশি ভালো। এই যে এরা, আল্লাহর নিকট দু'আ করছে, তার কাছে আশা-আকাংখা ব্যক্ত করছে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। আর এরা দীনের ফিক্হ ও 'ইলম শিখছে এবং মূর্খদের তা শেখাচ্ছে, এরাই উত্তম। আর আমি তো মু'আল্লিম তথা শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। একথা বলে তিনি শেষোক্ত মাজলিসে বসে পড়েন।

ইমাম মুসলিম উপরোক্ত মর্মের এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:[২১]

---

১৯. ইবনুল কায়্যিম, মিফতাহুস সা'আদাহ্, খ. ১, পৃ. ৬০

২০. সুনানু দারিমী, খ. ১, পৃ. ১১৭

২১. মুসলিম, কিতাবুত তালাক, হাদীছ নং-১৪৭৮; তাফসীরু ইবন কাছীর, খ. ৩, পৃ. ৮৪১, মুসনাদু আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৩২৮

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا.

আল্লাহ আমাকে না জোর-জবরদস্তকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন, আর না কঠোর করে। তবে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সহজ স্বাভাবিক মু'আল্লিম (শিক্ষক) হিসেবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনে অন্ততঃ চারটি আয়াতে এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মূল দায়িত্ব হলো তাঁর উম্মাতকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেওয়া। দু'টি সূরা বাকারায়, একটি সূরা আলে 'ইমরানে এবং অপরটি সূরা জুমু'আতে।

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে, সেই জ্ঞান অনুযায়ী 'আমল করে এবং সে জ্ঞান অন্যকে শেখায়, আমাদের পূর্ববর্তীকালের মনীষীগণ এ ধরনের লোকদেরকে 'রাব্বানী' নামে অভিহিত করতেন। মূলতঃ তাঁরা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর দিকেই ইঙ্গিত করতেন:[২২]

...وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ.

...বরং তোমরা 'রাব্বানী' হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।

আল্লাহর গুণবাচক নাম 'রব' গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'রাব্বানী' বলা হয়। আর সেই গুণ হলো কিতাবের জ্ঞান শিক্ষাদান ও অধ্যয়ন। ■

২২. সূরাতু 'আলি 'ইমরান-৭৯

চিন্তাধারা

শর'ঈ আহকাম প্রণয়নে ইবনুল কায়্যিম (রহ.)[২৭] এর মূলনীতি

ড. মো. ছামিউল হক ফারুকী

ইবনুল কায়্যিম (রহ.) ছিলেন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী একজন সুদক্ষ মুজতাহিদ। তিনি কোন নির্দিষ্ট ইমাম বা মাযহাবের অন্ধ অনুসারী ছিলেন না। তিনি কুরআন-সুন্নাহর দলীলসমূহ পর্যালোচনা ও গবেষণা করে নিজের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে সেগুলো থেকে মাসয়ালা চয়ন করতেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিধি বিধান বের করতেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্-ই ছিল তাঁর নিকট সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রকৃত মানদন্ড। অনুরাগ বা বিরাগ, প্রতিকূল বা অনুকূল, ভীতি বা লোভ ইত্যাদি কোন কিছুই তাকে তাঁর নীতি থেকে সামান্যতম বিচ্যুত করতে পারতো না। চরম বিরোধিতা, কঠোর নির্যাতন, জেল-জুলুম ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থাতেও তিনি সত্য-সঠিক নীতির উপর অটল-অবিচল থাকতেন।

---

২৭. তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবন আবি বাকর ইবন আয়্যুব ইবন সা'আদ ইবন হারিয ইবন যায়নুদ্দীন মাক্কী আয্যুর'ঈ আদ্ দামিশ্কী হাম্বলী। তাঁর লকব বা উপাধি ছিল "শামসুদ্দীন" এবং কুনিয়াত বা উপনাম ছিল "আবু 'আব্দুল্লাহ"। তিনি ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া নামেই সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

ইবনুল কায়্যিম ৭ই সফর, ৬৯১ হিজরী, ২৯ শে জানুয়ারী ১২৯২ খৃ. দামিশকে জন্ম গ্রহণ করেন। অনেকেই তার জন্মস্থান যুরা' নামক স্থান বলে উল্লেখ করেছেন । মুরাগী স্বীয় গ্রন্থ 'তাবাকাতুল উসূলীয়্যিন' এ তাঁর জন্মস্থান দামিশক বলেই উল্লেখ করেছেন। তার মতে ইবনুল কায়্যিমের পূর্বপুরুষগণ যুর'ার অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে হিজরত করে তারা দামিশকে চলে যান এবং সেখানেই তাঁর জন্ম হয়।

তিনি সাত বৎসর বয়সেই বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং পিতার নিকটেই তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। তিনি তাঁর পিতা, শিক্ষক শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া ও সমসাময়িককালের জগদ্বিখ্যাত বিদ্যান ও পন্ডিত ব্যক্তিগণের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অধ্যাবসায় ও জ্ঞান-গবেষণার ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই শরী'আহ্ এবং অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন।

তাওহীদ ও কালাম শাস্ত্র, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, ফারায়িজ, 'আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, নীতি বিদ্যা, তাসাউফ এবং আনরো অন্যান্য অনেক বিষয়েই তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।"ইবনুল কায়্যিমের শিক্ষা ছিল বিশেষভাবে বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ।"

৭১২ হিজরীর শেষের দিকে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া মিশর থেকে দামিশ্কে. প্রত্যাবর্তন করেন। সে সময়ই ইমাম ইবন তাইমিয়ার সংগে ইবনুল কায়্যিমের সাক্ষাৎ ঘটে। তখন থেকেই তিনি ইবন তাইমিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শিক্ষকের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে অবস্থান করেন। ইবন তাইমিয়ার সাক্ষাৎ লাভ থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বৎসর ইবনুল কায়্যিম তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেন। শেষবারে তিনি স্বীয় শিক্ষক ইবন তাইমিয়ার সঙ্গে একই জেলখানার পৃথক কামরায় বন্দী ছিলেন। শিক্ষকের মৃত্যুর পর তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি লাভ করেন। কারাগারে বন্দী অবস্থায় তিনি কুরআন অধ্যয়ন ও কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণায় মশগুল থাকতেন।

৭৩১ হিজরী, ১৩৩১ খৃ. ইবনুল কায়্যিম মক্কায় গমন করেন এবং ইসলামের অন্যতম ফরজ বিধান পবিত্র হজ্জ সম্পন্ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরো অনেকবার হজ্জ করেছেন এবং দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করেছেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি 'ইবাদাতের কঠোর সাধনায় রত থাকতেন এবং খুব বেশী বেশী কা'বা ঘর তাওয়াফ করতেন।

তিনি খতীব এবং ইমামতির দায়িত্বও পালন করেছেন। অধিকাংশ জীবনী লেখকের মতে তিনি জাওযিয়া মাদরাসার মসজিদেই ইমামতি করেন। এজন্যই ইবন কাছীর তাকে "জাওযিয়ার ইমাম ও তার তত্ত্বাবধায়কের পুত্র" বলে উল্লেখ করেছেন।

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা ইবনুল কায়্যিমের অন্যতম একটি পেশা ছিল। তার নিকট থেকে অনেক বড় বড় হাফিজ ও প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাফিজ ইবন রজব হাম্বলী, মুহাদ্দিছ যাহাবী, প্রখ্যাত মুফাস্সীর ও ফকীহ হাফিজ 'আল্লামা ইবন কাছীর প্রমুখ। ইবনুল কায়্যিম সাদরিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি স্থানে পাঠদান করেছেন।

তিনি ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, সুসাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক এবং নির্ভিক এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, 'আকাইদ, দর্শন, ইতিহাস, সমরনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি

শর'ঈ আহকাম ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা

ইবনুল কায়্যিম শর'ঈ আহকাম ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে খুবই পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ ছিলেন। আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তিনি শর'ঈ বিষয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন, যাকে ইসলামী পরিভাষায় ফাত্ওয়া বলা হয়। শর'ঈ মাসয়ালা মাসায়িল চয়ন ও ফাত্ওয়া দানের ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহকে গবেষণা করে তা থেকে সঠিক ও সুক্ষ্মভাবে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমাধান দানে তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

ফাত্ওয়া দান ও শর'ঈ আহকামের ক্ষেত্রে তাঁর মূলনীতি

ফাত্ওয়া দান ও মাসয়ালা মাসায়িল চয়নের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনুল কায়্যিম ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) এর মূলনীতিকে অনুসরণ করেছেন এবং সে সকল মূলনীতির আলোকেই তিনি ফাত্ওয়া দান ও মাসয়ালা-মাসায়িল চয়ন করেছেন। তাঁর মতে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল সুন্নাহর একান্ত অনুসারী ছিলেন এবং কোন বিষয়ে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা বা লেখাকে পছন্দ করতেন না। বরং সকল ক্ষেত্রেই তিনি হাদীছ ও সাহাবায়ে কিরামের মতামতকে পেশ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর ব্যাপারে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

وكان ﷺ شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد ا لحديث ويكره ان يكتب كلامه

"তিনি (ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রা.) সাধারণ পুস্তক রচনাকে খুবই অপছন্দ করতেন।

সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

'আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া শুধু অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি, বরং একই সাথে তিনি কলমও চালিয়েছেন অবিরতভাবে। তিনি একজন সুসাহিত্যিক এবং সুদক্ষ লেখক ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি মূল্যবান অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলোর অন্যতম হলো :

আল ইজতিহাদ ওয়াত্ তাকলীদ, উসূলুত্ তাফসীর, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন 'আন রাব্বিল 'আলামীন, আম্ছালুল কুরআন, বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ, আত্ তিব্ইয়ান ফি আক্সামিল কুরআন, আল্ জামি'উ বায়না সুনানি ওয়াল আছার, হাদিউল আর্ওয়াহ্ ইলা বিলাদিল আফ্রাহ, রাওজাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকীন, যাদুল মুসাফিরীন ইলা মানাযিলিস্ সা'আদাহ ফি হাদ্য়ে খাতামুল আম্বিয়া, যাদুল মা'আদ ফি হাদইয়ে খাইরিল 'ইবাদ, আস্ সুন্নাহ ওয়াল বিদ্'আহ, শিফাউল 'আলীল ফি মাসায়িলিল কাজা ওয়াল কাদ্র ওয়াল হিকমাহ ওয়াত্ তা'লীল, তারিকুল হিজরাতাইন ওয়া বাবুস্ সা'আদাতাইন, আত্ তুরুকুল হুকমিয়া ফিস্ সিয়াসাতিশ শার'ইয়্যা, মাদারিজুস সালিকীন বায়না মানাযিলি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন, মিফ্তাহু দারিস্ সা'আদাহ ওয়া মানশুরি বিলায়াতিল্ 'ইল্ম ওয়াল ইরাদাহ।

তিনি একজন সফল ও যোগ্য মুজতাহিদ হিসেবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের প্রকৃত ও সঠিক রূপ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তুলে ধরেছেন। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী সমাধান ইসলামে রয়েছে, তিনি তা অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে তুলে ধরেছেন। ইসলামী বিধি-বিধানের কার্যকারণ সমৃদ্ধ হওয়া, যৌক্তিক ও কল্যাণকরতা এবং তা যে হিকমত বা প্রজ্ঞাপূর্ণ সে বিষয়গুলো 'আল্লামা ইবনুল কায়্যিম অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলামকে মানব প্রকৃতির অনুকূল এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক বিধান হিসেবে উপস্থাপন করে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন অত্যন্ত সুনিপূণভাবে। কুরআন সুন্নাহর আলোকে আইন প্রণয়ন ও বিধি-বিধান রচনার যে সুক্ষ্ম ও চমৎকার নীতিমালা তিনি উদ্ভাবন করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তদানিন্তন সময়ের অধ:পতিত মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ইবন তাইমিয়া যে আন্দোলন শুরু করেছিলে, ইবনুল কায়্যিম তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং সহযোদ্ধার ভুমিকা পালন করেন। ইবন তাইমিয়ার মৃত্যুর পর ইবনুল কায়্যিম পুনর্জাগরণের এ আন্দোলনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন।

সে সময়ে মুসলিমদের অধ:পতনের মূল কারণ ছিল শিরক, বিদ্আত, ভ্রান্ত রীতি-নীতি ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হওয়া, রাজনীতি ও শ্বাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে উদাসীনতা এবং গতানুগতিক ও অন্ধ অনুকরণের আবর্তে হাত পা বেধে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করা।

ইবনুল কায়্যিম এগুলোর বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন এবং শিরক, বিদ্'আত ও কুসংস্কারের পংকিলতা থেকে ইসলামকে স্বচ্ছ ও নির্মল করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। একই সাথে তিনি তথাকথিত অন্ধ অনুকরণের আবর্ত থেকে মুসলিমদেরকে উদ্ধার করে কুরআন, সুন্নাহ, মুক্ত বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা তথা ইজতিহাদের চর্চা ও অনুশীলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে প্রাথমিক যুগের নির্ভেজাল ইসলামের দিকে নিয়ে যেতে প্রয়াসী ছিলেন।

১৩ই রজব ৭৫১ হিজরী, ২৬ শে সেপ্টেম্বার ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার রাত্রে 'ইশার আযানের সময় খ্যাতিমান এই মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি শুধুমাত্র হাদীছ সংকলন ও উপস্থাপন করাকে পছন্দ করতেন। তিনি নিজের কথা লিখতে পছন্দ করতেন না।"[২৮] তিনি আরো বলেন,

ان تأمل فتاواه و فتاوي الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الاخرى و رأى الجميع كانها تخرج من مشكاة واحدة حتى ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسئلة رواتان

"কেউ যদি ইমাম আহমদ ও সাহাবীগণের ফাত্ওয়া নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে একটি অপরটির অনুকূল দেখতে পাবে; দেখতে পাবে যে, উভয়টি একই আলোকচ্ছটা থেকে উৎসারিত। এমন কি যে বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে দ্বিমত সূচিত হয়েছে, সে মাসয়ালায় ইমাম আহমদেরও দু'টি বর্ণনা এসেছে।"[২৯]

মূলনীতিসমূহ :

পাঁচটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ) মাসয়ালা চয়ন ও ফাত্ওয়া দান করতেন। নিম্নে সেগুলোর বিবরণ দেয়া হল :

১. প্রথম মূলনীতি : নস বা কুরআন-হাদীছের দলীল। তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কুরআন-সুন্নাহর দলীল খুঁজতেন। কোন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর দলীল পেলে নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করতেন এবং অন্য কোন দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তাঁর এ মূলনীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

اذا وجد النص افتي بموجبه ولم يلتفت الي ماخالفه ولا من خالفه كائنا من كان

"তিনি যখন কোন নস (কুরআন-সুন্নাহর দলীল) পেতেন, তখন সে অনুযায়ীই ফাত্ওয়া দিতেন এবং এর বিপরীত কোন কিছুর দিকেই তিনি লক্ষ্য করতেন না বা এর বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির মতের প্রতি আদৌ কোন ভ্রূক্ষেপ করতেন না, তা সে ব্যক্তি যে- ই হোন না কেন।"[৩০]

এ ব্যাপারে তিনি আরো বলেন,

ولم يكن يقدم على ا لحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولاعدم علمه بالمخالفة الذى يسميه كثير من الناس اجماعا ويقدمونه على ا لحديث الصحيح

"তিনি কোন কাজ, মতামত, কিয়াস বা কারো কথা এবং কোন বিষয়ে মতভেদের ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকার কারণে যাকে অধিকাংশ লোক ইজমা' বলে আখ্যায়িত করে ও হাদীছের উপর সেটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, এর কোনটিকেই হাদীছের উপর কখনো অগ্রাধিকার দিতেন না।"[৩১]

এ মূলনীতির মূলকথা হল, কোন সমস্যার সমাধান, ফাত্ওয়া প্রদান বা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সর্বপ্রথম কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর দলীল পাওয়া গেলে তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে হবে এবং এর বিপরীত সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, সেটা যত বড় ইমাম, পীর-বুজুর্গ বা ওলী-দরবেশের কথা বা কাজই হোক না কেন।

---

২৮. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ১, পৃ. ২৯।
২৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯।
৩০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯–৩০।
৩১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০।

২. দ্বিতীয় মূলনীতি : সাহাবীগণের ফাতওয়ার অনুসরণ। কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর দলীল না পাওয়া গেলে সাহাবীগণের ফাত্ওয়ার অনুসরণ করা। যদি তিনি সাহাবীগণের কোন ফাত্ওয়া পেতেন, যাতে তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন মতভেদ নেই, তাহলে তা গ্রহণ করে সে আলোকে ফাত্ওয়া প্রদান করতেন। এক্ষেত্রে তিনি সাহাবীগণের কথা ব্যতীত অন্য কারো কথা গ্রহণ করতেন না। তাঁর এ মূলনীতি প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

واذ ا وجد الامام احمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا

"যখন ইমাম আহমাদ সাহাবীগণের পক্ষ হতে এ ধরনের কোন কিছু পেতেন, তখন তিনি কারো কোন কাজ, মতামত বা কিয়াসকেই এর উপর অগ্রাধিকার দিতেন না।"[৩২]

৩. তৃতীয় মূলনীতি : সাহাবীগণের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ থাকলে তার মধ্য থেকে যে মতটিকে কুরআন-সুন্নাহর অধিকতর নিকটবর্তী মনে করতেন, সেটিকে গ্রহণ করতেন। তবে এ ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতের বাইরে অন্য কারো মতকে তিনি গ্রহণ করতেন না।

এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

الاصل الثالث من اصوله : اذا اختلف الصحابة تخير من اقوالهم ما كان اقربها الى الكتاب والسنة ولم يخرج عن اقوالهم فان لم يتبين له موافقة احد الاقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول

"তাঁর তৃতীয় মূলনীতি হল, সাহাবীগণ কোন বিষয়ে মতভেদ করলে, তন্মধ্যে যেটি কুরআন-সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী সেটিকে গ্রহণ করতেন এবং তাদের কথার বাইরে যেতেন না। যদি তাদের কোন কথা সুস্পষ্টভাবে অনুকূল মনে না হত, তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি কোন একটিকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ না করে মতভেদ আকারে তা বর্ণনা করতেন।"[৩৩]

তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূলনীতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কুরআন-সুন্নাহর পর সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন সাহাবায়ে কিরামের উক্তিকে এবং তাদের কথার বর্তমানে অন্য কারো কথাকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না।

৪. চতুর্থ মূলনীতি : মুরসাল ও জ'ঈফ হাদীছ গ্রহণ করা, যদি না এ গুলোকে রদকারী কোন সহীহ্ হাদীছ পাওয়া যায়। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীগণের উক্তি পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে উল্লেখিত দু'ধরনের হাদীছকে তিনি কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। জ'ঈফ বা দুর্বল হাদীছ বলতে তিনি বাতিল, মুনকার বা মুত্তাহাম রাবীর বর্ণিত হাদীছকে বুঝাননি।[৩৪] বরং তাঁর মতে জ'ঈফ হাদীছ হাসান হাদীছেরই একটি শ্রেণী বিশেষ। এ ব্যাপারে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

اذا لم يجد فى الباب اثر يدفعه ولا قول صاحب ولا اجماع على خلافه كان العمل به اولي عنده من القياس

---

৩২. প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৩১।

৩৩. প্রাগুক্ত।

৩৪. ছিকাহ্ বা নির্ভরশীল রাবীর বর্ণিত হাদীছের বিপরীত কোন জ'ঈফ বা দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছকে 'মুনকার', যে হাদীছের বর্ণনাকারী লোকদের সাথে কথাবার্তায় মিথ্যা বলে অথবা একাকী এমন বিষয় বর্ণনা করে, যা দ্বীনের মূলনীতি বিরোধী, সে হাদীছকে 'মুত্তাহাম', যে সহীহ্ হাদীছের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি দুর্বল, তাকে 'হাসান লি-যাতিহি' এবং কোন জ'ঈফ বা দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছ যদি অন্য কোন এক বা একাধিক দুর্বল রাবীর বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহলে তাকে 'হাসান লি-গাইরিহি' বলে। ('আব্দুল কারীম মিরাক ও 'আব্দুল মুহসিন 'আব্বাদ, মিন আতইয়াবিল মানহি, ফি 'ইলমিল মুসতালিহ, (মদিনা : মাতাবি'উল জামি'আতিল মদিনাতিল মুনাওয়ারা, ১৪১০ হি.).পৃ. ১৫, ১৬, ২০ ও ৩৩।)

"যদি এ ক্ষেত্রে কোন হাদীছের বর্ণনা, সাহাবীর কোন কথা বা ইজমা' না পাওয়া যায়, যা মুরসাল বা জ'ঈফ হাদীছের রদকারী, তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁর (আহমাদের) মতে কিয়াসের চেয়ে এ ধরনের হাদীছের উপর 'আমল করা উত্তম।"[৩৫]

৫. **পঞ্চম মূলনীতি : কিয়াসের প্রতি 'আমল করা।** তাঁর এ মূলনীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনূল কায়্যিম বলেন,

فاذا لم يكن عند الامام احمد فى المسئلة نص ولا قول الصحابة او واحد منهم ولا اثر مرسل او ضعيف عدل الى الاصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة

"ইমাম আহমদের নিকট যখন কোন মাসয়ালায় কুরআন-সুন্নাহর দলীল বা সাহাবীগণের কথা বা তাদের কোন একজনের কথা অথবা মুরসাল বা জ'ঈফ হাদীছ না পাওয়া যাবে, কেবল তখনি পঞ্চম মূলনীতি অর্থাৎ কিয়াসের দিকে ধাবিত হওয়া যাবে এবং জরুরতবশত: তার প্রতি 'আমল করা যাবে।"[৩৬]

ইমাম আহমদের পঞ্চম মূলনীতি হলো কিয়াস। তাঁর মতে কিয়াসের প্রতি কেবল তখনি 'আমল করা যাবে, যদি তা একান্ত জরুরী হয় এবং উপরোক্ত চার মূলনীতির কোনটিই পাওয়া না যায়। পূর্ব বর্ণিত চারটি মূলনীতি বা দলীলের কোন একটিও যদি পাওয়া যায়, তাহলে কিয়াসের প্রতি 'আমল করা যাবে না।

উপরোক্ত পাঁচটি মূলনীতিকেই ইমাম ইবনুল কায়্যিম সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোর আলোকেই ফাত্ওয়া দান ও ফিক্হী মাসয়ালা চয়ন করেছেন। এ ক্ষেত্রে এ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, ইমাম ইবনুল কায়্যিম কি তাহলে ইমাম আহমদের অন্ধ অনুসারী ছিলেন? না, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নির্দিষ্ট কোন ইমাম বা মাযহাবের তাকলীদ বা অন্ধানুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এ কারণেই তিনি ইমাম আহমদের অন্ধ অনুসারী ছিলেন না। বরং এগুলোকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে তার আলোকে তিনি স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে শরী'আর মাস্য়ালাসমূহ চয়ন করতেন।

মূলনীতিসমূহ গ্রহণের কারণ

ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং ইসলামী শরী'আর আলোকে কোন মাসয়ালা চয়ন বা ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এ দু'টিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে সর্বোচ্চ। এ জন্যই ইবনুল কায়্যিম কোন মাসয়ালা চয়ন বা ফাত্ওয়া দেয়ার সময় সর্বপ্রথম নস বা কুরআন-সুন্নাহর দলীলকে বিবেচনায় আনতেন। কারণ মানব জাতির হিদায়াত ও সকল সমস্যার সমাধানের জন্য আল কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে আর এর প্রচার, ব্যাখ্যাদান ও এর আলোকে ফাত্ওয়া দান বা সমাধান প্রদানের মূল দায়িত্ব ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর। সুতরাং কোন বিষয়ের সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম এ দু'টির দিকেই ধাবিত হতে হবে। এ ব্যাপারে ইবনুল কায়্যিম বলেন :

"এ পবিত্র দায়িত্ব সর্বপ্রথম তিনিই পালন করেছেন, যিনি ছিলেন রাসূলগণের সরদার, মুত্তাকীদের ইমাম ও সর্বশেষ নবী। যিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তাঁর ওহীর আমানতদার এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার দূত। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ওহীর ভিত্তিতে ফাত্ওয়া দিতেন।...তাঁর ফাত্ওয়া ছিল আহকামের সমষ্টি ও সুস্পষ্ট বক্তব্য

---

৩৫. ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২।
৩৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩।

সম্বলিত, যা ছিল কিতাবেরই দ্বিতীয়টি, যার অনুসরণ করা, হুকুম মেনে চলা ও সে আলোকে পরস্পরের বিচার-ফায়সালা করা অত্যাবশ্যক। যতক্ষণ সেগুলোতে ফায়সালা পাওয়া যাবে, ততক্ষণ সেগুলোকে বাদ দিয়ে অন্য কোন দিকে ধাবিত হওয়া কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে সেদিকেই (কুরআন-সুন্নাহর দিকেই) প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যদি কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পরে মতবিরোধে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই সঠিক ও উত্তম কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই সর্বোত্তম।" (৪. সূরা আন নিসা : ৫৯)[৩৭]

কুরআন-সুন্নাহর পর তিনি দলীল হিসেব সাহাবায়ে কিরামের কথাকে গ্রহণ করতেন। কারণ তাঁরা শরী'আর মূলধারা হতে সবকিছু আহরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এমন কোন্ ভাল কাজ রয়েছে যেদিকে তাঁরা অগ্রগামী হননি? এমন কোন্ সঠিক পথ রয়েছে যেদিকে তারা ধাবিত হননি? শপথ আল্লাহর! তাঁরা জীবন সরোবরের মূলধারা হতে স্বচ্ছ-শীতল-সুমিষ্ট পানিতে অবগাহন করেছেন এবং ইসলামের নীতিমালাকে শক্তিশালী ও মজবুত করেছেন।"[৩৮]

যেখানে সাহাবীদের কোন মতামত পাওয়া না যাবে, সেখানে মুরসাল এবং জ'ঈফ হাদীছের উপর 'আমল করতে হবে, যদি অন্য কোন সহীহ্ হাদীছ এগুলোর বিরোধী না হয়। কারণ নিজের ব্যক্তিগত মতামত বা অন্য কারো মতামতের চেয়ে এটাই উত্তম। অধিকন্ত অধিকাংশ ইমামগণও এ ক্ষেত্রে মুরসাল ও জ'ঈফ হাদীছের উপরই 'আমল করেছেন।

যেখানে উপরোল্লিখিত কোন দলীল না পাওয়া যাবে, সেখানে কিয়াস বা রায়ের উপর 'আমল করা যাবে। কারণ ইসলাম একটি বাস্তবভিত্তিক জীবন বিধান। মানব জীবনের উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধান ইসলাম পেশ করে। যে ক্ষেত্রে বর্ণিত (নকলী) কোন দলীল না পাওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রে 'আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা সমাধান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম নিম্নবর্ণিত হাদীছটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন,

"মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নাবী (সা.) তাকে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বললেন, যদি তোমার নিকট কোন বিষয়ের ফায়সালার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে তুমি কি করবে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে ফায়সালা করব। রাসূল (সা.) বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে তা না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে আমি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ্র দ্বারা ফায়সালা করব। রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ্তেও যদি তা না পাও? তিনি বললেন, তাহলে তখন আমি আমার রায় দ্বারা চিন্তা-গবেষণা করে ফায়সালা দেব। মু'আয (রা.) বলেন, একথা শুনে রাসূল (সা.) আমার বক্ষদেশে হাত রেখে বললেন, প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন তাওফিক দিয়েছেন, যাতে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট।"[৩৯] (চলবে)

* 'ইবনুল কায়্যিম : জীবন, চিন্তাধারা ও সংস্কারসমূহ' বই থেকে সংকলিত ও সম্পাদিত।

---

৩৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১ – ১২।
৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬।
৩৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২০-২২১; বায়হাকী আস্ সুনানুস সাগীর, কিতাবু আদাবিল কাজী, বাবু মা ইয়াহকুমু বিহিল হাকিম, হাদীছ নং ৩২৫০।

চিন্তাধারা

রাগ না করার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন

রাগ কি?

মানুষ বিভিন্ন অনুভূতির মিশ্রণ দিয়ে গড়া। রাগও তেমনি এক প্রকার মানবীয় অনুভূতি। তাই স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রিত রাগ কোন মানসিক রোগ নয় তবে অনিয়ন্ত্রিত রাগ মানসিক রোগ বটে। আল্লাহর রাসূল (সা.) রাগ প্রসংগে বলেছেন 'আদম সন্তানের অন্তর একটি উত্তপ্ত কয়লা' (তিরমিজি)। রাগ হল মানুষের সংক্ষিপ্ত উম্মাদনা। বিখ্যাত মনীষি পিথাগোরাস বলেছেন, ক্রোধ মূর্খতা দিয়ে শুরু হয় এবং অনুতাপের সাথে শেষ হয়।

ক্রোধ হল শয়তানের প্রতারণার বড় ফাঁদ। রবিন্দ্রনাথ বলেছেন, যে মানুষ তার মনের ভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনা, তাদের মনেই অনেক রাগ হয়।

রাগ একটি সর্বজনীন আবেগ। আমরা সকলেই বিভিন্ন কারণে বিরক্ত, হতাশ বা ক্ষুব্ধ বোধ করি। কিন্তু, রাগ জন্মগতভাবে ভাল বা খারাপ নয়। অনেক সময়ই রাগ আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য অন্তর্নিহিত গাইড হিসাবে কাজ করে। তবুও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি নেতিবাচক ধারণা এমন রয়েছে যে রাগ মানেই উচ্চস্বরে এবং হিংসাত্মক আচরণ দেখিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। বাস্তবে, রাগ একটি স্টেরিওটাইপিক্যাল আচরণ এবং বেশ জটিল।

গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, "তোমার ক্রোধের জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া লাগবেনা, তোমার ক্রোধের দ্বারাই তুমি শাস্তি পাবে"। সাধারণত মানুষের যখন কোন দুঃখ থাকে তখন কেবল তাদের অবস্থা নিয়ে কাঁদে। কিন্তু একজন মানুষ যখন রাগ করে তখন তার নিজের ও অন্যের বিপদ ডেকে নিয়ে আসে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একজন রাগান্বিত ব্যক্তি রাগের সময় যুক্তিহীন অবস্থায় থাকে কিন্তু রাগ প্রশমিত হলে এবং যুক্তিতে ফিরে আসলে আবার নিজের সাথেই রাগ করে। রাগ হল একটি পঙ্গু, নষ্ট ও গন্ধযুক্ত আবেগ যা লেগে থাকলে গন্ধ বের হবেই।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "রাগ মানুষের ঈমানকে এমনভাবে নষ্ট করে যেমন তিক্ত ফল মধুকে নষ্ট করে দেয়"। যে সব কিছুতেই রাগ করে, ধরে নিতে হবে যে, সে কোন কারণ ছাড়াই রাগ করে।

এরিস্টটল বলেছেন, "যে কেউ রাগ করতে পারে, এটি সহজ, তবে সঠিক ব্যক্তির সাথে সঠিক ডিগ্রীতে এবং সঠিক সময়ে সঠিক উদ্দেশ্যে এবং সঠিক উপায়ে রাগান্বিত হওয়া অধিকাংশের ক্ষমতার মধ্যে নেই এবং সহজও নয়"।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "ক্রোধ অহিংসার শত্রু এবং অহংকার। এটি এমন এক দৈত্য যা তাকে গ্রাস করেই তবে ছাড়ে"। রাগ করা মানে অন্যের দোষের কারণে নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই প্রতিশোধ নেয়া। ক্রোধ ধরে রাখা মানে জ্বলন্ত কয়লা অন্য কারো দিকে ছুড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেই আকড়ে ধরে রেখে জ্বলে-পুড়ে মরা।

মানুষকে ধোকাদান ও প্রতারণার ক্ষেত্রে ক্রোধ তথা রাগ হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তানের বড়

অস্ত্র। শয়তান মানুষকে ক্রোধের বশবর্তী করে বিচ্যুতির ফাঁদে ফেলে এবং বিপথগামীর দিকে নিয়ে যায়।

হিংসাত্মক উত্তেজনার কারণে মানুষ তার বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং তার মস্তিষ্ক অচল হয়ে পড়ে। এ কারণে কিছু মানুষ শিষ্টাচার ও ভদ্রতার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। ক্রোধ হচ্ছে দুর্বলতা; কিন্তু মানুষ একে শক্তি বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রোধ হচ্ছে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যা আপনাকে আগুন ধরিয়ে আর আপনি অন্যদের দগ্ধ করেন। সুতরাং, এই আগুন কেবল আপনাকেই আহত করে না, বরং অন্যদেরও করে।

ক্রোধের বিধ্বংসী প্রভাব

যদিও ক্রোধ হচ্ছে প্রাকৃতিক অস্থির অনুভূতি। ক্রোধ মানুষের মানসিক অবস্থাকে উদ্বেগ, বিষণ্নতা, অপরাধবোধ, হতাশার দিকে নিয়ে যায়।

নিউ ইয়র্কের 'ইউনিভার্সিটি অফ রোচেস্টার'এর গবেষকরা 'জার্নাল অফ সাইকোসোমাটিক রিসার্চ' নামক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় জানিয়েছেন, "যারা নিজেদের আবেগ চেপে রাখে তাদের দ্রুত মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা যারা মন খুলে নিজের আবেগ প্রকাশ করেন তাদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

রাগের আতিশয্যে মানুষ অশালীন কথা-বার্তা ও তালাকের মতো জঘন্য বিষয়ে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনকি কখনো কুফরি বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করে বসে।

রাগের কারণঃ

শারীরিক কারণে রাগঃ

রাগের বহিঃপ্রকাশের কারণ যখন শারীরিক কোনো কষ্ট বা যন্ত্রণার অনুভূতি থেকে হয় তখন তাকে ফিজিক্যাল অ্যাঙ্গার বলে। যেমন ক্ষুধা পাওয়া, অসুস্থ হওয়া। শিশুদের ক্ষেত্রে এই ফিজিক্যাল অ্যাঙ্গার এর লক্ষণ বেশি প্রকাশ পায়। এই ধরনের রাগ তাড়াতাড়ি ওঠে এবং নেমেও যায়।

মানসিক সমস্যার কারণে রাগঃ

মানসিক অসন্তুষ্টি, দীর্ঘদিনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনবরত কাজ করে চলা ,আকাঙ্খার অতৃপ্তি, গ্রহণযোগ্যতা বা মান্যতার অভাব ইত্যাদি। এ সমস্ত রাগের উৎস হল, ভয়, হতাশা, অপরাধবোধ, হীনমন্যতা, অহংবোধ, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, ঈর্ষা এবং সামাজিক মর্যাদা, মাদকাসক্তি, আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি এবং মতাদর্শের পার্থক্য, অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল ভাবা, উদ্বিগ্নতা, বিষন্নতা ইত্যাদি।

এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যতিক্রমি মানসিক সমস্যা, যেমন ব্যক্তিত্বের ত্রুটি, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার, শুচিবায়িতা, মাদকাসক্তি, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, কনডাক্ট ডিসঅর্ডার, ডিমেনশিয়া ইত্যাদির অন্যতম উপসর্গ হল রাগ।

খুঁতখুঁতে স্বভাব, হীনমন্যতাবোধ, অতিরিক্ত কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব, সবকিছুতে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ, ব্যর্থতা মেনে না নেওয়ার মনোভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের মানুষের মধ্যে অল্পতেই রেগে যাওয়ার প্রবণতা থাকে।

রাগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের মানসিক অবস্থার একটি বহিঃপ্রকাশ।

ফ্রয়েডের মতে, অন্যের প্রতি আক্রমণ মানুষের নিজের প্রতি ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির এক রকম আত্মরক্ষামূলক আচরণই হল রাগ। আলবার্ট বান্দুরার মতো মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত রাগ মূলত তিনি পরিবেশ থেকেই শেখেন। তার মতে, ব্যক্তি তার আগ্রাসীভাবের

কারণে চারপাশের মানুষের কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হয়। অনেক সময় অন্যের আগ্রাসনও যখন পরিবার ও সমাজ কর্তৃক নানাভাবে উৎসাহিত হতে দেখে, সেটাও তাকে উৎসাহিত করে। তবে এ বিষয়ে অন্যতম শক্তিশালী তত্ত্ব জন ডোরাল্ডের ফ্রাস্ট্রেশন-অ্যাগ্রেশন মতবাদ। রাগ মূলত মানুষের আশাভঙ্গ, নিষ্ফলতা, ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া। বিশেষ করে সে আশাভঙ্গ বা বিফলতার মাত্রা যদি গ্রহণযোগ্য না হয় বা এর মাত্রা যদি গভীরতর হয়।

ছোটবেলায় যদি কেউ এমন পরিবেশে বড় হয়, যেখানে মা-বাবা বা অভিভাবকেরা অল্পতেই রেগে যান, সেই পরিবারে শিশুরাও একই ধরনের আচরণ শেখে।

রাগ প্রকাশের ধরণঃ

সাধারণভাবে মানুষ রাগান্বিত হলে মূলতঃ চার ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে।

আক্রমনাত্মক প্রতিক্রিয়াঃ রাগের এই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক যেমন চিৎকার চেচামেচি করা, অন্যকে আঘাত করা, জিনিষপত্র ভাংচুর করা, নিজেকে নিজেই আঘাত করা, আত্মহত্যা করতে উদ্যত হওয়া ইত্যাদি বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো।

নিষ্ক্রিয়/আক্রমনাত্মক মিশ্ররাগ প্রতিক্রিয়াঃ রাগের এই ধরণের প্রতিক্রিয়া শুরু হয় বাহ্যত রাগ সুপ্ত রেখে আর সময় সুযোগমত আক্রমনাত্মক বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এর শেষ হয়।

নিষ্ক্রিয় রাগ প্রতিক্রিয়াঃ এই ধরণের রাগের বাহ্যত বহিঃপ্রকাশ হয়না। অর্থাৎ ব্যক্তি রাগ সহ্য করে নেয়। কোন ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখায়না।

দৃড়তা পূর্ণ যৌক্তিক রাগ প্রতিক্রিয়াঃ এই ধরণের রাগের বাস্তবে যৌক্তিকতা থাকে এবং এর বহিঃপ্রকাশও ঘটে ন্যায্য নীতিতে।

কিন্তু অধ্যাপক এফ্রেম ফার্নান্দেজের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা অনুসারে, রাগকে ছয়টি প্রকাশের মাত্রা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

এর মধ্যে রয়েছে:

রাগের গতি-প্রকৃতি (অভ্যন্তরীণ বনাম বাহ্যিক)

রাগের প্রতিক্রিয়া (প্রতিশোধমূলক বনাম প্রতিরোধমূলক)

রাগের মোড (শারীরিক বনাম মৌখিক)

রাগের আবেগ (নিয়ন্ত্রিত বনাম অনিয়ন্ত্রিত)

রাগের উদ্দেশ্য (পুনরুদ্ধারমূলক বনাম শাস্তিমূলক)।

রাগের প্রকারভেদঃ

দৃঢ়তাপূর্ণ রাগঃ

দৃঢ়তাপূর্ণ রাগ আসলে রাগের প্রকাশের একটি গঠনমূলক বহিঃপ্রকাশ। এতে হতাশা বা রাগের অনুভূতি সাধারণত ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে রাগকে চেপে রাখা হয়। মৌখিক অপমান এবং শারীরিক বিস্ফোরণ অবলম্বন করার পরিবর্তে, রাগ এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যা গঠনমূলক পরিবর্তন তৈরি করে যা একজন ব্যক্তিকে তাদের ইচ্ছা পূরণের কাছাকাছি নিয়ে আসে - কষ্ট বা ধ্বংস না করে। এইভাবে দৃঢ় ক্রোধের অভিব্যক্তি অন্য মানুষের অধিকার এবং সীমানা লঙ্ঘন না করেই একজন ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করতে পারে।

দৃঢ় ক্রোধ হল একটি শক্তিশালী প্রেরণা যা ভয়কে কাটিয়ে উঠতে, অন্যায়কে মোকাবেলা করতে এবং জীবনে আরও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আচরণগত রাগঃ

আচরণগত রাগ একটি শারীরিক এবং প্রায়শই আক্রমনাত্মক, রাগান্বিত অনুভূতির প্রতিক্রিয়া। এটি মানুষকে রাগ প্রকাশের চরম প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে এবং হিং হয়ে উঠতে পারে। এই ধরণের আচরণে বাহ্যিক ক্ষতির উদ্দেশ্যমূলক প্রেরণা থাকে।

রাগান্বিত অবস্থায় জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা বা ছুঁড়ে মারা বা শারীরিকভাবে ভয় দেখানো বা কাউকে আক্রমণ করা এ জাতীয় রাগের বহিঃপ্রকাশ।

দীর্ঘস্থায়ী রাগঃ

দীর্ঘস্থায়ী রাগ হল অন্য লোক বা ব্যবস্থার প্রতি চলমান অসন্তোষ। দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধের বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘমেয়াদী বিরক্তি এবং চিরস্থায়ী জ্বালা। এই ধরনের রাগের দীর্ঘসূত্রিতা একজনের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর গভীরভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

উদ্বায়ী বা আকস্মিক রাগঃ

এটি এমন একটি আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া যা মুহূর্তেই জ্বলে উঠে পরক্ষণেই নির্ভাপিত হয় ছাইভস্ম হয়ে।

উদ্বায়ী রাগ হল একটি বিস্ফোরক ধরণের রাগ যাকে কখনও কখনও "হঠাৎ রাগ" বলা হয়। এটি ঘটতে পারে যখন কেউ মৌখিক বা শারীরিকভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। এটি প্রায়শই চিৎকার, চেচামেচি, জিনিস ছুঁড়ে ফেলা এবং শারীরিক আক্রমন পর্যন্ত করে ফেলে।

নিষ্ক্রিয়-আক্রমনাত্মক রাগঃ

প্যাসিভ-আক্রমনাত্মক রাগ হল আক্রমনাত্মক রাগের বিপরীত কারণ এতে ক্ষোভ ভিতরে লুকিয়ে রেখে পরে সুবিধামত সময়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। রাগের নিষ্ক্রিয়-আক্রমনাত্মক আচরণ মৌখিকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, যেমন বিদ্রুপ, হাসিঠাট্টা ও উপহাস করা।

প্রতিশোধমূলক রাগঃ

প্রতিশোধমূলক ক্রোধকে সাধারণত বাহ্যিক ঘটনা বা ব্যক্তি দ্বারা মুখোমুখি হওয়া বা আক্রমণ করার একটি সহজাত প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এটিকে রাগের মারাত্মক এবং বিপর্যয়কর বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েও এ ধরণের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে।

স্ব-অপমানজনক রাগঃ

স্ব-অপমানজনক রাগ স্ব-লজ্জার অনুভূতির উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। যারা নিজদের আশাহীন, অযোগ্য, অপমানিত বা লজ্জিত বোধ করেন তারাই নেতিবাচক স্ব-কথোপকথন, আত্ম-ক্ষতি, পদার্থের অপব্যবহার এবং আত্মহননের বিকৃত চেষ্টার মাধ্যমে তাদের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

ইসলামী শরিয়তে রাগকে দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ বৈধ রাগ ও অবৈধ রাগ।

বৈধ রাগঃ

ইসলাম একেবারে রাগহীন জীবনকে উৎসাহিত না করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষোভ প্রকাশের কথাও বলেছে। ইসলাম যেসব ক্ষেত্রে রাগ করার অনুমতি দিয়েছে তা হতে হবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এবং অবশ্যই তা দ্বীনের উদ্দেশে, আল্লাহর উদ্দেশে, নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশে নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ঈমান পূর্ণ করার চারটি আমল, যা কিছু মানুষকে দেব আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য, যা কিছু নেব আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য। যাকে

ভালোবাসব আল্লাহর উদ্দেশে ভালোবাসব। যার প্রতি রাগ করব তাও আল্লাহকে খুশি করার জন্য।' -তিরমিজি

বস্তুত জাতীয়, ধর্মীয়, মানবিক আদর্শ ও মূল্যবোধ রক্ষার জন্য প্রয়োজনে ক্ষোভ ও রাগকে কাজে লাগাতে হবে। তবে অন্যায় দমন করতে গিয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া বা অন্যায় পন্থায় অন্যায় দমন করা কোনটাই কাম্য নহে।

অবৈধ রাগঃ যে রাগ ইসলামের সীমা লংঘন করে এবং ব্যক্তির মানসিক-শারীরিক, সমাজ ও পরিবারের ক্ষতি করে।

অবৈধ রাগের কারণে যে সমস্ত ক্ষতি সাধিত হয়ঃ

অবৈধ রাগের কারণে প্রধানত পাঁচ ধরণের ক্ষতি সাধিত হয়।

শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়।

শারীরিক ক্ষতিঃ

ক্রোধ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটায়ঃ

আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে আমরা বুঝি আমাদের মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা মূলতঃ মস্তিষ্ক নয় বরং বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। যে কোন কাজ করার আগে আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিবেককে কাজে লাগাই। সে অনুসারে মস্তিষ্ক শরীরের দুটি কন্ট্রোলিং সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তার একটি হল নার্ভাস সিস্টেম অপরটি হল এন্ডোক্রাইন সিস্টেম।

নার্ভাস সিস্টেম কিভাবে ক্রোধকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ক্ষতি করে?

আমরা যখন অত্যধিক বিবেকহীন মাত্রায় রাগান্বিত হই, তখন আমাদের ব্রেইনের ফ্রন্টাল লোব উত্তেজিত হয়। বিচার বুদ্ধি এরিয়া একদিকে যেমন ভলান্টারি নার্ভাস সিস্টেম অনুগত হাত-পা-শরীরের মাংশপেশীকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত উত্তেজিত করে আক্রমনাত্মক কাজ করাতে উদ্যত হয়, অন্যদিকে বডি হরমোনাল সিস্টেমের হরমোনকে রক্তে প্রবাহিত করে বিভিন্ন জাগায় মেসেজ পাঠিয়ে তার কাজ করতে নির্দেশ দেয়।

মানুষের মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবে যে বিচারবুদ্ধি এরিয়া থাকে তা মানুষের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং ভাল মন্দ বিশ্লেষণ করে মস্তিষ্কের এমিগডালাসহ অন্যান্য অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ব্রেইনের বিচার বুদ্ধি এরিয়া আবার মানুষের বিবেকের কথামত পরিচালিত হয়। যেমন, আমি যদি বিবেকহীনভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হই, তখনই কেবল ব্রেইন আমার কথামত হত্যা করার শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো করে।

মস্তিষ্কের মেডিয়াল টেম্পোরাল লোবে 'বাদাম' আকৃতির একটি অংশ থাকে যাকে বলে এমিগডালা। এমিগডালা সব ধরণের রাগ, ভয় এবং দুঃখের মতো আবেগ এবং সেইসাথে আগ্রাসন নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী। এমিগডালা ঘটনা এবং আবেগের স্মৃতি সঞ্চয় করতে সাহায্য করে যাতে একজন ব্যক্তি ভবিষ্যতে একই ধরনের ঘটনা চিনতে সক্ষম হয়। যখন একজন মানুষ অনেক বেশী রাগান্বিত হয়, ফ্রন্টাল লোব থেকে এমিগডালাতে নিয়ন্ত্রণহীন ইম্পালস্ পাঠায়। তখন প্রথমেই এমিগডালা তার ঠিক নীচে থাকা হাইপোথ্যালামাসকে উজ্জিবীত করে। হাইপোথেলামাস কর্টিকোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (সিআরএফ) সিক্রেশন করে। এই সিআরএফ হরমোন পিটুইটারি গ্লান্ডকে এক্টিভেট করে যার ফলে এড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন সিক্রেশন করে রক্তে ছেড়ে দেয়। এই হরমোন রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে

কিডনির ঠিক উপর অংশে টুপির মত বসে থাকা এড্রেনাল গ্লান্ডকে এক্টিভেট করে, ফলে স্ট্রেস হরমোন যেমন কর্টিসল, এড্রেনালিন এবং নর-এড্রেনালিন সিক্রেট করে। এই সমস্ত হরমোনই রাগের কারণে দানব আকৃতিতে রূপ নেয়া এবং সৃষ্ট শারীরিক ক্ষতির জন্য দায়ী। রাগের কারণে এড্রেনাল গ্লান্ড থেকে নির্গত কর্টিসল চার ভাবে ব্রেইনের বিচার বুদ্ধি এরিয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলেঃ

প্রথমত, এড্রেনাল গ্লান্ড থেকে নির্গত কর্টিসল রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্কের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স যেখানে বিচার বুদ্ধি এরিয়া অবস্থিত সেখানে গিয়ে নিগেটিভ ইম্পালস্ প্রেরণ করে ফলে ব্যক্তি স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে যে কোন ধরণের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে।

দ্বিতীয়ত, ব্রেইনের হিপোক্যাম্পাস এরিয়ায় কর্টিসলের বিরূপ প্রভাবঃ রক্তে কর্টিসলের মাত্রা বেশী হবার কারণে হিপোক্যাম্পাস এরিয়ার কাজে বাধা সৃষ্টি করায় স্বল্প মাত্রার স্মরণ শক্তি লোপ পায়, ফলে রাগের মাথায়কি বলেছেনা বলেছে সব ভুলে যায়।

তৃতীয়ত, অতিমাত্রায় কর্টিসল সিক্রেশনের কারণে ভাল লাগা হরমোন বা হেপী হরমোন 'সরোটানিন' লেভেল রক্তে কমে যায়, ফলে চোখে-মুখে-নাকে এবং আচরণে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠে।

চতুর্থত, মানুষের ভাষা ও কথা বলার প্রাণ কেন্দ্র হল মস্তিষ্কের ব্রোকাস এরিয়া। অতিরিক্ত কর্টিসল সিক্রেশনের ফলে এই ব্রকাস এরিয়াতে নিগেটিভ সিগনাল প্রাপ্ত হয়। কথা বলার শক্তি ও নির্দেশনা যেখান থেকে পরিচালিত হয় সেখানটাই যদি আক্রান্ত হয় তাহলে কথা বলবে কিভাবে। ফলে দেখা যায় বেশী রাগান্বিত হলে মানুষ কথা বলতে পারে না।

দেখা যাচ্ছে, স্ট্রেস রেসপন্সের কারণে হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি গ্লান্ড এবং এড্রেনাল গ্লান্ড-এই তিন মিলে শরীরকে অস্বাভাবিক হরমোনাল চেইন রিয়েকশনের জন্য প্রস্তুত করে এবং একটি অক্ষশক্তিতে রূপ নেয় (এইচপিএ এক্সিজ)।

রেগে যাওয়ার সাথে সাথে শরীরের পেশী টানটান হয়ে যায়। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে, ক্যাটেকোলামাইন নামে পরিচিত নিউরোট্রান্সমিটার রাসায়নিক নির্গত হয়যার ফলে কয়েক মিনিট পর্যন্ত অপশক্তির বিস্ফোরণ ঘটে। এ ক্ষেত্রে বাম হেমিস্ফেয়ার বেশী স্টিমুলেটেড হবার কারণে রাগান্বিত হলে শরীরের ডান দিক বেশী শক্তি অর্জন করে। মানুষ বেশী আবেগ তাড়িত বা রাগান্বিত হলে, মস্তিষ্কের কিছু অংশে ডোপামিন অনেক বেশী সিক্রেশন হয় এবং অন্য অংশে কম হয় ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মের ব্যঘাত ঘটে। একটি নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত ডোপামিন যদিও একটি হেপী হরমোন, কিন্তু রাগের কারণে নিয়ন্ত্রণহীন সিক্রেশন বা একেবারে কম সিক্রেশন উভয়টাই অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং ডোপামিন রাগের মাথায় অনেক বেশী সিক্রেশনের কারণে সিজোফ্রেনিয়া, মেনিয়া এবং হেলোসিনেশনে রূপ নিতে পারে আবার অনেক কম সিক্রেশনে পার্কিনশন ডিজিজ হয়ে যেতে পারে।

নার্ভাস সিস্টেমের উপর রাগের প্রভাবঃ

আমাদের শরীরের কাজের রেগুলেটরি সিস্টেম হল দুটি যারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। একটি হলো নার্ভাস সিস্টেম যা কাজ করে নার্ভ ফাইবারের মাধ্যমে বাহিত হয়ে ইলেক্ট্রিক সিগনাল প্রয়োগ করে, অন্যটি হল হরমোনাল সিস্টেম যা কাজ করে রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে কেমিকাল মেসেঞ্জারের মাধ্যমে।

আমাদের শরীরের নার্ভাস সিস্টেমের সমস্ত কার্যকলাপ মূলতঃ দুই ভাবে চালিত হয়। একটি হল বাহ্যিকভাবে দেখা শারীরের বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগের কাজ যা ভলান্টারি নার্ভাস সিস্টেম

যা আমাদের ইচ্ছামত পরিচালত হয় যেমন কথা বলা, হাটা চলাফেরা করা ইত্যাদি, অপরটি হল ইনভলান্টারি নার্ভাস সিস্টেম যার পরিচালনা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের উপর। এই সিস্টেমটি শরীরে ভিতরে ভিসারাল লেভেলে অনবরত সক্রিয় থাকে। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ যে সিস্টেমের উপর মানুষের সরাসরি কন্ট্রোল নাই, সে নার্ভাস সিস্টেম আবার দুই ভাবে কাজ করে। একটি হল, প্যারাসিম্প্যাথেটিক এবং অপরটি হল সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। এই দুইটি সিস্টেম পরস্পরের বিপরীত মুখী কাজ করে। একটি সিস্টেম সক্রিয় থাকলে অন্যটি অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যে সমস্ত কাজে আরাম আয়েশ ও ঘুম-বিশ্রাম হয়, শরীর শান্ত থাকে, প্রশ্রাব-পায়খানা করতে হয়, হজম করে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়, মানুষের পরস্পরের ভালবাসায় সম্পৃক্ত করে সেই সমস্ত কাজের সাথে জড়িত হল প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। আর তার ঠিক উল্টো কাজ যেমন নিজকে রক্ষা ও আক্রমনাত্মক করার জন্য প্রস্তুত করা হল সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের কাজ। আবার মানুষ এমনই প্রাণী যার সাথে আবেগ জড়িত। এই আবেগও আবার দুই রকম। পজিটিভ আবেগ এবং নিগেটিভ আবেগ। পজিটিভ আবেগ হল দয়া-মায়া, ক্ষমা, মানুষের মধ্যকার ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ, সন্তান-বাবা-মার ভালবাসা, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন, মানুষের ভাল কিছু দেখে আনন্দ আর দুঃখ দেখে ক্রন্দন ইত্যাদি। নিগেটিভ আবেগ হল রাগ, ভয়, বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি। পজিটিভ আবেগ কন্ট্রোল হয় প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আর ভাল লাগা ভালবাসা হরমোন (অক্সিটসিন হরমোন) এবং হেপী হরমোন (সেরোটানিন, ডোপামিন, এন্ডোর্ফিন) দিয়ে। নিগেটিভ আবেগ কন্ট্রোল হয় সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম স্টিমুলেটেড হয়ে এবং স্ট্রেস হরমোন (কর্টিসল, এড্রেনালিন, নর-এড্রেনালিন) নির্গত করে। অবাক বিস্ময়েলক্ষ করার বিষয় হল, প্রকৃতির সর্বত্রই সৃষ্টিতে বস্তুর মধ্যে যেমন জোড়া তত্ত্বের প্রমাণ করে তেমনি কাজ-কর্মেও জোড়া তত্ত্ব নির্দেশের প্রমাণ বিদ্যমান।

রাগান্বিত হলে স্বাভাবিকভাবেই প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় আর সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম সক্রিয় হয়ে নিজকে প্রস্তুত করে। নিজের প্রতিরক্ষা বা মারামারি করা, হাত-পা ছুড়ে মারা, চিৎকার করা, দৌড়ানো ইত্যাদির জন্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম এবং হরমোনাল সিস্টেম হাইপোথেলামাস-পিটুইটারি-এড্রেনাল এক্সিজ (এইচপিএ এক্সিজ) পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

বিবেক বুদ্ধির উপর রাগের প্রভাবঃ

মানুষ বিবেকবান-বুদ্ধিমান প্রাণী। পশু-পাখী তাদের বেঁচে থাকার জন্য, টিকে থাকার জন্য যতটুকুন বুদ্ধি-জ্ঞান দরকার ততটুকুনই আছে। এক প্রাণী আরেক প্রাণীর খাবার। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরা খাবারের প্রয়োজন মিটে গেলে চলে যায়। কোন রকম প্রতিহিংসার আশ্রয় নেয়না। আর একজন মানুষ রাগান্বিত হলে অন্য মানুষকে শুধু হত্যাই করে না, বরং কেটে টুকরো টুকরো করে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। এর কারণ হল নিয়ন্ত্রণহীন রাগান্বিত অবস্থায়বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান সবই সাময়িকভাবে হলেও লোপ পায়। মস্তিষ্ক সমস্ত নার্ভাস এবং হরমোনাল সিস্টেম পরিচালনা করলেও এই মস্তিষ্ককে আবার পরিচালিত করে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান- এই তিনের যথাযথ প্রয়োগই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

রাগ সুস্থ চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। স্মৃতিশক্তি, সৃজনশীলতা এবং একাগ্রতা দুর্বল হয়ে পড়ে। চিন্তাশক্তি একপেশে, অতিরঞ্জিত এবং অযৌক্তিক অনমনীয়করে ফেলে। অনুমানকে সত্য হিসাবে বিবেচনা করা শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ যুক্তিহীন হয়েযেতে পারে।
রাগ আকাশে মেঘের ন্যায়সত্য-সূর্যকে ঢেকে রাখে, আগুনে ঘি ঢেলে দেয়, বারুদের বিস্ফোরণ ঘটায়।

কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের উপর রাগের প্রভাবঃ

মানুষের গড় হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৮০ বিট, কিন্তু মানুষ যখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, তখন পালস ১৮০ বিট প্রতি মিনিট আকারে ত্বরান্বিত হতে পারে। একইভাবে, রাগ রক্তচাপ ১২০/৮০ থেকে ২২০/১৩০ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে, যা হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।
রাগান্বিত হলে হার্ট রেট, রক্ত চাপ, রক্তনালীর উপর চাপ, রক্তের গ্লুকোজ এবং ফ্যাটি এসিড লেভেল ইত্যাদি বেড়ে যায়। কোন মানুষের রাগ যখন অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন রক্ত নালীগুলো বার বার প্রদাহ হয়ে যায়। প্রদাহপ্রাপ্ত এই রক্তনালীর ভিতরের ওয়ালে দিনে দিনে রিপিয়ার কাজকর্মের কারণে নানান জিনিষ জমা হয়ে রক্তনালী চিকন হয়ে যায়। গবেষণা অনুযায়ী, দীর্ঘ সময় ধরে মানসিক চাপে থাকলে মস্তিস্কেও প্রদাহ সৃষ্টি হয়। যে কারণে ব্রেন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক এবং বুকে ব্যথার ঝুঁকি বহুগুণে বাড়ে।
হঠাৎ রাগ চলাকালীন সময়ে এড্রেনাল গ্লান্ড থেকে নির্গত এড্রেনালিন হৃৎন্ডিকে দ্রুত স্পন্দিত করে এবং ধমনী এবং শিরাগুলিকে সংকুচিত করে, যার ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। রাগের ঘটনা শেষ হয়ে গেলে রক্তচাপ সাধারণত স্বাভাবিক হয়েযায়।
কখনও কখনও ঘন ঘন কিংবা অত্যধিক রাগের সময়ে এনজাইনা পেক্টরিস (বুকে ব্যথা) হয় কারণ সাময়িক সময়ের জন্য রক্তনালীগুলি সংকুচিত হয়সরু হয়েযায়, হৃৎপিণ্ডে রক্ত এবং অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস পায়।
গবেষকরা দেখেছেন যে রাগান্বিত হওয়ার পরপরই দুই ঘন্টার মধ্যে একজন ব্যক্তির হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি প্রায়পাঁচগুণ (৪.৭৫ গুণ) বেড়ে যায় এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি তিনগুণ বেশি (৩.৬২ গুণ) বেড়ে যায় ।
হঠাৎ রাগ হৃৎপিণ্ডের ইলেক্ট্রিকাল ইম্পালস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে, এর কারণে স্ট্রেস হরমোন সিক্রেশন বেড়ে গিয়েসি-রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন (সিআরপি) এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যা এথেরোস্ক্লেরোসিস এবং ভবিষ্যতে হৃদরোগের ঝুঁকির সাথে যুক্ত।
ভারী উত্তোলন মস্তিস্কে চাপ বেড়ে যেমন এনিউরিজম ফেটে যেতে পারে, তেমনি প্রবল আবেগ, যেমন বিচলিত হওয়া বা রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি কারণে রক্তচাপ বেড়ে পরবর্তীতে এনিউরিজম ফেটে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
একটি সমীক্ষায় দেখা গেছেযে অত্যধিক রাগান্বিত হয়ে বিস্ফোরণের পর দুই ঘন্টার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধা থেকে মস্তিস্কে স্ট্রোক বা মস্তিস্কের মধ্যে রক্তপাত হওয়ার ঝুঁকি তিনগুণ বেশি। (চলবে)

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

যে কোন জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতি আজকাল খনিজ সম্পদের ব্যবহারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার অনেক আগে থেকেই অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে বিবিধ খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কোন একটির মাথাপিছু ব্যবহার যে কোন জাতির সমৃদ্ধি যাচাইয়ের একটি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি শুরু থেকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে প্রথম দিকে খনিজ সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন, সর্বোপরি এর বাণিজ্যিক ব্যবহার ছিল অতি অল্প মাত্রায়। বিভিন্ন ফোরামের আলোচ্য বিষয় হিসেবে জাতির জন্য খনিজ সম্পদের ভবিষ্যত এবং এর প্রচ্ছন্নতার প্রতি আগ্রহ এখন অনেক বেশি। অর্থনীতির একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের প্রতি এটি একটি সাফল্যজনক অঙ্গীকার যে খনিজ সম্পদের পদ্ধতিগত উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ভূগর্ভে লুকায়িত খনিজ সম্পদ একটি অন্যতম আল্লাহ প্রদত্ত ঐশ্বর্য ভান্ডার। মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও সার্বিক অগ্রগতির চাবিকাঠি। নৈসর্গিক নানা প্রক্রিয়ার ফলে দীর্ঘকাল যাবত এমন অসংখ্য সুপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ভূ-অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। মাটি খুঁড়ে এর অনুসন্ধান ও উদ্ধার এর মাধ্যমে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে আরও সম্মুখে। এই গুপ্ত সম্পদ আহরণের মাধ্যমে যে কোন জাতি তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম।

খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির উৎস

খনিজ উৎস দুই প্রকার। যথা ১. জৈবিক ২. অজৈবিক

জৈবিক খনিজ উৎস ৪ প্রকার। যথা-

১. কয়লা, ২. চুনাপাথর, ৩. গ্যাস, ৪. তেল

অজৈবিক খনিজ উৎস দুই প্রকার। যথা-১. ধাতব ২. অধাতব

ধাতব খনিজ আবার ৭ প্রকার ঃ

১. দস্তা, ২. স্বর্ণ, ৩. সীসা, ৪. রূপা, ৫. পারদ, ৬. তামা. ৭. তিজষ্ক্রিয় খনিজ

অধাতব খনিজ ৫ প্রকার ঃ

১. সালফার, ২. ক্যালসিয়াম, ৩. সোডিয়াম, ৪. শ্বেতকর্দম, ৫. পটাশিয়াম

খনিজ সম্পদগুলি আবার কঠিন ও তরল অবস্থায় বিদ্যমান। দীর্ঘকাল প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে জৈবিক রূপান্তর কিংবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে খনিজ সম্পদের সৃষ্টি। তাই প্রতিটি খনিজ পদার্থের রাসায়নিক সূত্র ও গুণাগুণ সম্পন্ন। ভূতাত্ত্বিক স্তর, ইতিহাস ও ভৌগলিক অবস্থানই কোন অঞ্চলের খনিজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও এর বাণিজ্যিক উত্তোলন নির্ভর করে।

এই প্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ামকগুলিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

অতীতে বাংলাদেশে খনিজ আহরণের অন্তরায়সমূহ

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান খনিজ সম্পদের জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনাময়; তবু প্রয়োজনের তুলনায় এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত খনিজের সংখ্যা নিতান্ত কম। উত্তোলনের পরিমাণও কম। এর মূল কারণ মূলতঃ তিনটি। এ গুলো হচ্ছে :

১. প্রাকৃতিক ঃ অতি গভীর শিলাস্তর, দুর্গম পাহাড় এলাকা কিংবা গভীর সমুদ্রতলে যে খনিজ সঞ্চিত আছে তা উত্তোলন করতে হলে প্রয়োজন উন্নতমানের প্রযুক্তি, আর্থিক স্বাচ্ছল্য, দক্ষ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সরঞ্জাম। অতীতে এগুলোর কোনটাই আমাদের তেমন ছিল না বললেই চলে। তাই খনিজ আহরণ সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ১১৫ মিটার-১.২ কিলো মিটার গভীরে গন্ডোয়ানা কয়লা খনি ও বঙ্গোপসাগরের নীচে হয়তো প্রচুর মূল্যবান খনিজ লুকিয়ে আছে। কিন্তু দুর্ভেদ্যতা (Inaccessibility) এর কারণে এখন পর্যন্ত কাংখিত মানে তা আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২. রাজনৈতিক ঃ দীর্ঘ ১৯০ বছর ঔপনিবেশিক শাসনের সময় এখানে ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও খনিজ অনুসন্ধান কার্যক্রম উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯৫০ এর পর পাকিস্তানী শাসনামলে জরিপ ও অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়।

৩. অর্থনৈতিক ঃ দেশী-বিদেশী প্রকৌশলীদের কারিগরি নির্দেশনায় অনুসন্ধান কাজ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ প্রয়োজন। ফলে অনুসন্ধানের কাজ ব্যাহত হয়েছে। বর্তমানে যা চলছে তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশী কোম্পানীর অনুদানের উপর ভিত্তি করে।

৪. প্রযুক্তি ঃ প্রকৌশলীদের প্রযুক্তিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতি যেমন- কূপ খনন যন্ত্র (drilling machine) ও গবেষণা এবং পরিশোধনাগার এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কারণ, কোন খনিজ পদার্থের আকরিক (ore) অবস্থায় তোলার পর এগুলো পরিশোধিত করে গড়ে তোলা হয়। অতীতে ১৯৫০ সালের পূর্বে এ জাতীয় কোন ভিত্তিই বাংলাদেশের ছিল না। বর্তমানে তুলনামূলকভাবে সেদিক থেকে আমরা অনেক অগ্রগামী।

মহান আল্লাহ এ দেশবাসীর কল্যানে ভূতল ও অতল গহ্বরে অনেক খনিজ জ্বালানি ও শক্তি সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন। প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রায়োগিক প্রয়োগে সেগুলির অনুসন্ধান ও আহরণ করে সুষ্ঠুভাবে উন্নয়ন কাজে লাগানো। মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা খনিজ সম্পদসমূহ আহরণের উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদ

১. কয়লা : বাংলাদেশের মাটির নীচে রয়েছে পর্যাপ্ত কয়লা। বাংলাদেশে সন্ধানপ্রাপ্ত কয়লা খনিগুলো হচ্ছে ঃ ১. জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ কয়লাখনি ২. দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি, ৩. রংপুরের পীরগঞ্জের খালাশপীর কয়লাখনি, ৪. সিলেটের কানাইঘাটের সোনারতনপুঞ্জি পাহাড়ের কয়লাখনি ৫. চট্টগ্রামের আলী কদম থানার তৈল মৌজার কয়লা খনি। ৬. পঞ্চপুকুর কয়লাখনি ৭. দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়নের দীঘিপাড়া কয়লাখনি ৮. দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার রতনপুর কয়লাখনি ৯. দিনাজপুরের ফুলবাড়ি কয়লা খনি ১০. দিনাজপুরের বুজরুক হরিনা কয়লাখনি ইত্যাদি।

এর মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে বড়পুকুরিয়ার কয়লাখনি। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়নের বড়পুকুরিয়া মৌজার চৌহারী গ্রামে ১৯৮৫ সালে প্রথম কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া যায়। খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় কয়লার সন্ধান পাবার পর ১৯৮৫ সালের ১৮

এপ্রিল মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ড্রিলিং শুরু করে। ড্রিলিং এর তিনশ ফুট নীচে কয়লার সন্ধান এবং ৫ শত ২৫ ফুট নীচে কয়লার স্তর পাওয়া যায়। পার্বতীপুর রেলওয়ে জংশনের অনতিদূরে বড়পুকুরিয়ার অবস্থান। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ দফতর মতে বড়পুকুরিয়ার কয়লা বিটুমিনাস শ্রেণীর এবং উন্নতমানের। যোগাযোগের সুবিধা এবং উচ্চমানের কয়লার কারণে বড়পুকুরিয়ায় ১৯৯৪ সালের ২৭ জুন কয়লা উত্তোলন বাস্তবায়নের কাজ উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশের প্রথম ভূ - গর্ভস্থ কয়লাখনি হিসেবে পরিচিত বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উৎপাদনে যায়। ২০০৯ সাল থেকে খনিটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ কয়লার ৮৩ ভাগ ব্যবহারের জন্য পাশেই ২০০ একর জমির উপর ২৫০ মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে।

২০০৪ হোসাফ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের অনুকুলে রংপুরের পীরগঞ্জের খালাসপীরে কয়লা খনিতে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনার জন্য লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি অনুসন্ধান কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে। এ ছাড়া ২০০৮ সালে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়া কয়লাখনিতে অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবংলার অনুকুলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মনঞ্জুর করা হয়। অনুসন্ধ্যান কার্যক্রম এখনও সমাপ্ত হয়নি।

২. পিটকয়লা : বাংলাদেশে পিট কয়লাগুেলার উল্লেখযোগ্য মজুদ রয়েছে। রাজশাহী , নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা এলাকার চলন বিলে, মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার হাকালুকি হাওড়ের চাতলবিল, মাদারীপুরের বাঘিয়া ও চান্দালি , খুলনার কোলা , কিশোরগনজের নিকলী ও সুনামগঞ্জ জেলায় প্রায় ৩৯ কোটি টন পিট কয়লা পাওয়া গেছে। সুদীর্ঘকাল থেকে এসব অঞ্চলের মানুষ মাটির কয়েক ফুট গভীরে চাষাবাদ, পুকুর খনন করতে গিয়ে পিট কয়লা পেয়ে যেত। সংগ্রহের পর শুকিয়ে রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। পিট কয়লার সুবিধা হলো এর প্রজ্বলন ক্ষমতা বেশ ভালো ও সংরক্ষণ করা যায়।

৩. প্রাকৃতিক গ্যাস : গ্যাস বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনাময় একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। এ প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়াম খনিতে তৈলের উপরিভাগে ভাসমান অবস্থায় থাকে। আবার তৈল ব্যতীত প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি দেখা যায়। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ। দেশে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ চাহিদা প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে থাকে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সিলেট জেলার ৪ টি, সুনামগঞ্জে ১ টি, হবিগঞ্জে ৩ টি, ব্রাহ্মবাড়িয়ায় ১টি, ঢাকায় ১টি, কুমিল্লায় ১টি, ফেনীতে ১টি, নোয়াখালীতে ১টি, খাগড়াছড়িতে ১টি, কক্সবাজারে ১টি, চট্টগ্রামে ১টি, নাটোরে ১টি, ভোলায় ১টি, মৌলভীবাজারে ১টি, নরসিংদিতে ১টি অবস্থিত। তিতাস, বাখরাবাদ, কৈলাসটিলা, মেঘনা , সাঙ্গু, সালদা নদী, বিয়ানিবাজার, জালালাবাদ, হবিগঞ্জ, ছাতক, হরিপুর (সিলেট), রশিদপুর (সিলেট), সেমুতাং (খাগড়াছড়ি), কুতুবদিয়া, কামতা (গাজীপুর), বেলাব (নরসিংদি), শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ (সিলেট), বিবিয়ানা (হবিগঞ্জ), মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র প্রধান।

সবচেয়ে বেশি গ্যাস উৎপাদিত হয় তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র হতে। গ্যাস প্রাপ্তির দিক থেকে বাখরাবাদ সবচেয়ে বড় এবং সেমুতাং সবচেয়ে ছোট গ্যাসক্ষেত্র। বাখরাবাদে সঞ্চিত

গ্যাসের পরিমাণ ১৪৯৮.৬ বিলিয়ন ঘনফুট। এ গ্যাস ক্ষেত্র হতে ১১০ মাইল দীর্ঘ লাইন এর সাহায্যে চট্টগ্রাম মহানগরী ও শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়। কৈলাসটিলা গ্যাসক্ষেত্র সিলেট জেলায় অবস্থিত। ১৯৬২ সালে আবিষ্কৃত হয়। এখান থেকে প্রথমবার ১৯৮৩ সালে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়। কৈলাসটিলা গ্যাসক্ষেত্রটিতে মোট ৭টি কূপ আছে। কৈলাসটিলার ৭ নম্বর কূপ হতে ৭ মে ২০২২ রাত হতে ১৯ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু করা হয়। প্রসঙ্গত ২০০৭ সালে কৈলাসটিলা ৭ নম্বর কূপটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এতদিন ২টি কূপ দিয়ে ২৯ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হতো।[৪০]

৪. তেল ঃ বাংলাদেশের এ পর্যন্ত চারটি স্থানে তেলবাহী স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে হরিপুর ও শালবাহান তেলক্ষেত্র প্রধান। শালবাহান বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেল খনি। সিলেটের হরিপুর কূপ থেকে তেল উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। শালবাহান তেলক্ষেত্র নিয়েও একসময় গভীর চক্রান্ত হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরে তেল অনুসন্ধান চলছে।

৫. কঠিন শিলা ঃ দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া, সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জি আইল্যান্ড, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম এবং পঞ্চগড় জেলায় কঠিন শিলার মজুত রয়েছে। এরমধ্যে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির আয়তন ১.৪৪ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯৪ সালের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি) এর অনুকূলে খনিজ মঞ্জুর করা হয়। খনি হতে বর্তমানে কঠিন শিলা উত্তোলিত হচ্ছে। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি থেকে প্রতি বছর কঠিন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ উপকূলীয় শহর রক্ষা বাঁধ, সেতু, সড়ক-মহাসড়ক, রেলপথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নদীশাসন, উচ্চ ভবন নির্মাণে ব্যবহার হয়ে থাকে। মধ্যপাড়া গ্রানাইট পাথরের মজুতটি ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ জরিপ বিভাগ আবিষ্কার করে। এখানে অতি অল্প গভীরতায় গ্রানাইট পাথরের মজুদ ১৭ কোটি ৪০ লাখ টন বলে প্রমাণিত হয়, যার প্রায় ৪০% উত্তোলনযোগ্য।[৪১]

৬. চিনামাটি ঃ নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার বিজয়পুর, শেরপুর জেলার ভাঙ্গা ও চট্টগ্রাম জেলার সাতগাঁও, কাঞ্চনপুর, এলাহাবাদ, দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া এবং নওগাঁর পত্নীতলায় চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজয়পুরে প্রায় ২৫ লাখ টন চিনামাটি বা সাদামাটির মজুদ রয়েছে। দেশে এ মাটি 'বিজয়পুর ক্লে' নামেই সমধিক পরিচিত।

৭. চুনাপাথর ঃ সিলেটের টেকেরঘাট, বালাপুঞ্জি, ভাঙ্গারহাট, লালঘাট ও বাঙালি বাজার, সুনামগঞ্জের তাহিরপুর, বগুড়ার কুচমা, জয়পুরহাট, কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং নওগাঁ জেলার জাহানপুর ও পরাননগরে চুনাপাথরের মজুদ রয়েছে। নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার তাজপুর গ্রামে মিলেছে চুনাপাথরের সর্ববৃহৎ মজুদ। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এখান থেকে চুনাপাথর উৎপাদন সম্ভব হলে বাংলাদেশের কোন

---

৪০. কৈলাসটিলার পরিত্যাক্ত কূপ থেকে গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু, অর্থনৈতিক রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব, ৯ মে ২০২২, পৃ. ১২।

৪১. ড. বদরুল ইমাম, গ্রানাইট খনি, দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০১৯, পৃ. ১১।

সিমেন্ট কারখানাকে আর চুনা পাথর আমদানি করতে হবেনা।' ১৯৬৫ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে সরবরাহের জন্য সিলেটের টেকেরঘাট খনি থেকে প্রথমবারের মতো চুনাপাথর উত্তোলন শুরু হয়। সেই মজুদ গত শতকের শেষ হয়ে গেছে।[৪২]

৮. কাঁচবালি ঃ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে কয়টি খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে তন্মধ্যে কাঁচবালি অন্যতম। কাঁচবালি দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ। এতে রয়েছে মূল্যবান সিলিকনের মিশ্রন। বৃহত্তর সিলেটের শাহজিবাজার, নয়াপাড়া, কুলাউড়া, তেলিয়াপাড়া, শেরপুর জেলার শ্রীবরদী থানার বালিজুরি, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার নওয়াপাড়া-দত্তসার, চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার দক্ষিণ জংগল এলাকায়, সুনামগঞ্জের লাকমা-লালঘাট এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠের স্বল্প গভীরে কাঁচবালি পাওয়া যায়। জামালপুরে ব্রহ্মপুত্র নদীর চরে কাঁচবালি পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র নদের এক একটি চর যেন কাঁচবালির খনি। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার অন্তর্গত লাকমা ছড়ায় কাঁচবালির খনি ভূ-গর্ভে অবস্থিত। দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা খনি এলাকায় এবং বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির উপরিস্তরে কাঁচবালি পাওয়া যায়। বড়পুকুরিয়ায় কোটি ৯ কোটি মেট্রিক টন কাঁচবালি মজুদ আছে।

৯. সমুদ্র উপকূলীয় খনি সম্পদ ঃ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ১৭ টি মূল্যবান খনিজ সম্পদের সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে ৮টি অতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খনিজ সম্পদের মূল্য হাজার হাজার কোটি টাকা। বঙ্গোপসাগরের সৈকতের বালিতে খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৬১ সালে। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতের বদর মোকান, টেকনাফ, শীষখালী, ইনানী, লনাধরা এলাকা, মাতাবাড়ি দ্বীপ, সেন্টমার্টিন, কুতুবদিয়া, মহেশখালী ছাড়াও নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ, চর জব্বার, চরভাটা, লক্ষ্মীপুরের রামগতি, কমলনগর, পটুয়াখালী কুয়াকাটা, ভোলার মনপুরা দ্বীপে এবং বৃহত্তর খুলনার উপকূলীয় এলাকায় মূল্যবান খনিজ সম্পদের সন্ধান মিলেছে। সমুদ্র উপকূলীয় খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে ১. জিরকন, ২. রুটাইল, ৩. ইলমেনাইট, ৪. ম্যাগনেটাইট, ৫. গার্নেট, ৬. কায়ানাইট, ৭. মোনাজাইট, ৮. লিউকক্সি। এ ছাড়াও ইনানীতে রয়েছে কালো সোনা নামক মূল্যবান খনিজ পদার্থ। বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক ধারণায় বলা হয়েছে, এখানে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের মূল্য লক্ষাধিক কোটি টাকারও বেশি। ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার সাগর মোহনার ঢালচর ও ভাসানচরে মিলেছে খনিজ বালির সন্ধ্যান। অনুসন্ধানী কোম্পানির বাংলাদেশি অ্যাডভাইজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ডঃ মাহমুদ আলম জানিয়েছেন- চরফ্যাশনের ঢালচর ও ভাষাণ চরে জিরকন, রুটাইল, গার্নেট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট নামের পাঁচটি মূল্যবান খনিজ রয়েছে।[৪৩] এছাড়াও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বালিতে স্বর্ণ আকরিক উদ্ভাবন করা হয়েছে। সৈকত স্বর্ণবালি প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে স্বর্ণ আহরণ করা গেলে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। ■

---

৪২. এবার নওগাঁয় চুনাপাথর খনির সন্ধান, বিশেষ প্রতিনিধির রিপোর্ট, দৈনিক সমকাল, ২২ এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১-১৫

৪৩. উদ্ধৃত নাসির লিটন, 'ভোলার বালুকা বেলায় সম্ভাবনার খনি, দৈনিক সমকাল, ৩০ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২০।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ আমাদের দেশে কোথাও কোথাও আযানের দু'আর শেষে "ইন্নাকা লা তুখলিফুল মি'আদ, বাক্যটি বৃদ্ধি করে পড়া হয়, এটি কি কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? দলীলসহ উল্লেখ করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আবদুর রহমান, নাটোর।

উত্তর ঃ আযানের দু'আর শেষে "ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ" বাক্যটি যুক্ত করার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে এ বাক্য সম্বলিত হাদীসটি সহীহ নয়। বরং শায। শায বলা হয়- নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস বর্ণনাকারী যদি এমন হাদীস বর্ণনা করেন যা তার চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীসের বিপরীত। শায হাদীস দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভূক্ত। কেননা আযানের দু'আর ব্যাপারে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন এদের অধিকাংশই এ বাক্যটি উল্লেখ করেন নি। এটি বিশুদ্ধ হলে এটিকে বাদ দেয়া বৈধ হতো না।

অপরদিকে সহীহ আল বুখারী 'আন আলী ইবন আইয়াশ (রা:) এর উদ্ধতি দিয়ে ইমাম আল বাইহাকী (র.) এর আস সুনানুল কুবরা মা'আ আল জাও হারুন নাকী, গ্রন্থে আযানের দু'আ সংবলিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং হাদীসটির শেষে "ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ" বাক্যটিও বর্ণিত হয়েছে। সকলের অবগতির জন্য পুরো হাদীসটি উল্লেখ করা হলো।

عن جابربن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ من قال حين يسمع النداء الهم انى اسئلك بحق هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات مُحَمَّدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتى (رواالبخارى فى الصحيحعن على بن عياش)

হাদীসটির বঙ্গানুবাদ: জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছন, যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে, হে আল্লাহ! আমি এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের অসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নৈকট্য ও মর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে আপনার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌছান, নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে।

(সহীহ আল বুখারীতে আলী ইবন আইয়াশ (রা.) থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে) (খ: ১, অধ্যায়: সালাত, পৃ ৪১০;)

এছাড়াও আরব বিশ্বের প্রখ্যাত আলেমে দীন রিয়াদ দারুল ইফতার নীতি নির্ধারণী সদস্য শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (র.) লিখেছেন, হাদীস বিশারদগণের মধ্যে অন্যরা বলেছেন, এর সনদ সহীহ। এটা বলা যায় এতে কোনো সন্দেহ নেই। আরব বিশ্বের শীর্ষ আলেমে দ্বীন বিয়াদ তথা সৌদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী ও রিয়াদ দারুল ইফতার গ্রান্ড মুফতী আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (র) বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। বায়হাকী (র) সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতওয়া বিন বায; ১০/৩৬৪-৩৬৫; ফাতওয়া আল লাজনা আদ দায়েমা: ৬/৮৮; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃ ৩৪২;)

উপরিউক্ত আলোচনা ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, انك لا تخلف الميعاد সংবলিত আযানের দু'আর উপরিউক্ত হাদীসটি সহীহ।

প্রশ্ন-২ ঃ আমি একটা কোম্পানীর বেতনভুক্ত কর্মচারী বা কর্মকর্তা। কোম্পানীর জন্য কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করা আমার চাকরীর একটা অংশ। একবার একটা পার্টির কাছ থেকে আমি কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করি। কেনাকাটা ও লেনদেন সবকিছু চুকিয়ে যাওয়ার পর পার্টি আমাকে কিছু টাকা হাদিয়া দিতে চায়- যার সাথে পূর্বোক্ত কেনাকাটার দূরতম কোনো সম্পর্কযুক্ত আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। এ হাদিয়া নেয়ার ব্যাপারে ইসলামী শরী'আ বা কুরআন হাদীস কি বলে?

উত্তরঃ আপনার কাছে আসা এই হাদিয়াটা নিস্পাপ, বেগুনাহ ও মা'সুম তরীকায় আসা একটি বড় বা কবিরা গুনাহের টোপ ও বার্তা বাহক। এর উপরের খোলসটা পূত পবিত্র ও নিষ্কলুষ, আর এর অভ্যন্তর ও পরিণাম কবিরা গুনাহে নিমজ্জন ও হাবুডুবু খাওয়া। এর হেদায়াত বাণী হিসেবে মহানবী রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদীস পেশ করে শেষ করতে চাই। হাদীসটি হলো (বঙ্গানুবাদ) আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁর নাম ছিল লুতবিয়া। আমর এবং আবু উমার বলেন, তাকে যাকাত বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি মদীনায় ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের জন্য (অর্থাৎ এগুলো যাকাতের মাল) আর এগুলো আমার। এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন: কি হলো কর্মাচারীর! আমি তাকে (যাকাত সংগ্রহের জন্য) প্রেরণ করি। সে ফিরে এসে বলে, এটা তোমাদের জন্যে আর ওটা আমার জন্য। সে তার পিতার ঘরে অথবা তার মায়ের ঘরে বসে থাকছে না কেন? তার পর দেখুক তাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কি না? সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিজ ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে। সে চিৎকাররত উট অথবা হাম্বা হাম্বা রবে চিৎকার রত গরু, অথবা ভ্যাঁ ভ্যাঁ রবে চিৎকাররত ছাগল কাঁধে বহন করে নিয়ে আসবে। অত:পর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হস্তদ্বয় এমনভাবে উপরের দিকে উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর বগলের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। তিনি দু' বার বললেন, "হে আল্লাহ! আপনার বিধান আমি যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছি।

(সহীহ আল বুখারী কিতাবুল আহকাম, অনুচ্ছেদ: ২৪ কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ, হাদীস নং- ৭১৭৪; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: চৌত্রিশ, কিতাবুল ইমারাহ, অনুচ্ছেদ: ৭ সরকারী কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ করা, হাদীস নং- ৪৫৮৯; এখানে সহীহ মুসলিমের হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বা ভাতার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কাজে কিংবা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের কোনো কাজে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে বেতন ভাতার অতিরিক্ত কোনো কিছু গ্রহণ করা শরী'আত অনুমোদন করে না। সেটা পারিশ্রমিক, হাদীয়া, নজরানা, উপঢৌকন প্রভৃতি যে কোনো নামেই হোক না কেন। শরী'আত এটাকে ঘুষ ও দুর্নীতি নামে অবিহিত করে এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

প্রশ্ন-৩ ঃ আমার পনের ভরি স্বর্ন-অলংকার আছে। বিয়ের সময় আমার স্বামী, বাবা- মা ও আত্মীয় স্বজনগণ আমাকে দিয়েছেন। এসব স্বর্ণ-অলংকারের যাকাত দিতে হবে কি না, দিতে হলে আমার স্বামী অথবা আমার পিতা-মাতা দিবেন, না আমাকেই দিতে হবে? আমি কোনো উপার্জন করি না। আমার হাতে কোনো টাকাও নেই। আমি কিভাবে এর যাকাত দেবো?

যাকিয়া সুলতানা, দোহাজারী, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ বিয়ের সময় স্ত্রীদেরকে মহরানা ও উপঢৌকন হিসেবে স্বামী, মাতা-পিতা ও আত্মীয়- স্বজনগণ যেসব অলংকার দিয়ে থাকেন সেটা স্বর্ণের হোক বা রুপার হোক- তার মালিক সাধারণত স্ত্রীগণই হয়ে থাকেন। আপনার স্বামী, বাবা-মা ও আত্মীয় স্বজনগণ যে পনের ভরি স্বর্ণ-অলংকার আপনাকে দিয়েছেন আপনিই তার মালিক। স্বর্ণের যাকাতের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান হলো, স্বর্ণ যদি সাড়ে সাত ভরি বা তার চাইতে বেশি হয় এবং কারো মালিকানায় যদি তা পূর্ণ এক বছর থাকে তাহলে তার উপর যাাকাত ফরয হয়। এই পরিমাণ স্বর্ণ যতদিন কারো মালিকানায় থাকবে ততদিন তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করে নির্ধারিত মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থ্যাৎ শতকরা ২.৫০ (আড়াই) টাকা হারে প্রতি বছর আপনারই আদায় করতে হবে। আপনার স্বামী বা আপনার বাবা-মা যদি আদায় করে দেন তবে এটা হবে তাদের মেহেরবানী, দয়িত্ব নয়। যদিও তারা আদায় করে দিলে আদায় হয়ে যাবে। যাকাত আদায় করার অর্থ যোগাড় করতে যদি আপনি না পারেন এবং নিরুপায় হয়ে যান তাহলে দু'টি পন্থার যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। এক: কিছু স্বর্ণ বিক্রি করে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা। দুই: একান্ত আপন কাউকে কিছু স্বর্ণ হেবা, উপহার বা দান করে আপনার মালিকানায় সাড়ে সাত ভরি থেকে কমিয়ে রাখা-যাতে আপনার উপর আর যাকাত ফরয না থাকে।

প্রশ্ন-৪ ঃ আমি মান্নত করেছিলাম আল্লাহ আমার সন্তানকে রোগমুক্ত করলে আমি প্রতি মাসে এক সপ্তাহ রোজা পালন করব। তখন থেকে আমার সন্তান সুস্থ আছে। আমার মান্নতের ২৬ বছর হল। বিভিন্ন সমস্যার কারণে এখনও আমি মান্নতের রোজা আদায় করি নাই। এখন যদি আমি এর কাফফারা স্বরূপ ৩টি রোজা আদায় করে কিছু সাদকা করি তাহলে কি আল্লাহ আমাকে দায় মুক্ত করবেন।

উত্তর ঃ আপনি আল্লাহর সাথে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার সন্তানকে রোগমুক্ত করলে আপনি প্রতি মাসে এক সপ্তাহ রোযা রাখবেন। মহান আল্লাহ আপনার এই প্রার্থনা কবুল করে আপনার কলিজার টুকরা সন্তানকে রোগমুক্ত করেছেন। ফলে আপনার উক্ত প্রতিজ্ঞা পালন করা অর্থাৎ প্রতি মাসে এক সপ্তাহ রোযা রাখা আপনার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। আপনি আপনার কৃত প্রতিজ্ঞা পালন না করে আপনি বড় ধরনের গুনাহগার হচ্ছেন। আপনার মানত করার আগেই চিন্তা করা ও ভাবা দরকার ছিল আপনি কি মানত করছেন এবং তা পূরণ করতে পারবেন কি না? আপনি মানত করে নিজেই নিজের উপর প্রতি মাসে এক সপ্তাহ রোযা রাখা ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এতে আপনাকে কেউ বাধ্যও করেনি। সুতরাং আপনার এ মানত আপনাকেই পূরণ করতে হবে।

এখন থেকে আপনার মানত অনুযায়ী প্রতি মাসে এক সপ্তাহ রোযা রাখতে থাকুন এবং সম্ভব হলে সাধ্যমত বিগত ছাব্বিশ বছরের অনাদায় রোযাগুলোর কাযাও আদায় করতে থাকুন। এভাবে যতদিন সম্ভব রোযা রাখতে থাকুন। শারীরিকভাবে যদি রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে যান, তবে যখন থেকে রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে যাবেন তখন থেকে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত যে রোযাগুলো অনাদায় থেকে গেলো আপনার মৃত্যুর সে রোযাগুলোর ফিদইয়া আদায় করে দেয়ার জন্য আপনার সন্তান বা ওয়ারিশদের প্রতি অছিয়ত করে যাবেন।

তিনটি রোযা ও কিছু সাদকা করলে আল্লাহ আপনাকে দায়মুক্ত করবেন কি না সে সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ফিদইয়ার পরিমাণ হলো (হানাফী মাযহাব মতে) প্রতি রোযার জন্য কম পক্ষে অর্ধ সা' গম অর্থাৎ ১.৭৫ কেজি গম অথবা তার মূল্য। আপনার যদি ফিদ্ইয়া আদায় করার মত কোনো অর্থ- সম্পদ না থাকে তাহলে অনাদায় রোযাগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। (দেখুন, ফাতওয়ায়ে শামী- ৩খ, পৃ: ৭৪১; এইচ, এম, সাঈদ কম্পানী করাচী, পাকিস্তান; ফাতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, খ: ১২, পৃ ১৪৪ ও ১৬২;)

বি:দ্রঃ ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের পূর্বেই অছিয়ত পূরণ করতে হবে, অত:পর যে সম্পদ থাকবে তা বন্টন হবে।

প্রশ্ন-৫ ঃ মৃত ব্যক্তির কন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত আছে। মৃত ব্যক্তির সম্পদ কিভাবে বন্টিত হবে?

এডভোকেট জহির উদ্দিন, ঢাকা

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে কন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা ছাড়া আর কেউ যদি জীবিত না থাকে এবং তার কোনো ঋণ কিংবা সম্পদের ব্যাপারে কোনো অছিয়ত যদি না থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদ সমান তিন ভাগ করে দুই ভাগ কন্যার এক পুত্রকে এবং এক ভাগ কন্যার এক কন্যাকে বন্টন করে দিতে হবে।

আর যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ঋণ থাকে এবং তিনি যদি সম্পদের ব্যাপারে কোনো অছিয়ত করে থাকেন তার তাহলে ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের পূর্বে প্রথমে তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে অত:পর অছিয়ত পূরণ করার পর অবশিষ্ট সম্পদ (যদি থাকে তাহলে) তার উপরিউক্ত ওয়ারিশদের মধ্যে উপরিউক্ত নিয়মে বন্টন করতে হবে।

يرث ذوو الأرحام بأن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا أولاد لأم

"একজন পুরুষ পাবে দু'জন নারীর সমপরিমাণ" এ নিয়মে যাবিল আররহামগণ উত্তরাধিকারী হবে, যদিও তারা বৈপিত্রেয় ভাই হয়।

দেখুন,

১. ড. ওহাবা আয যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু: খ-৮, পৃ- ৩৯১ দারুল ফিকর

২. তেরাযি শরহে সিরাজি, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা পৃ ২২৫;

ফতোয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা